অ্যালবিনো

-বুদ্ধদেব গুহ

উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী
স্থাপিত-১৮৯৭
খুলনা

অ্যালবিনো

- বুদ্ধদেব গুহ

ফোনটা বাজছিল।

একবারের বেশীবার বাজা মানেই, ঋজুদা বাড়ি নেই। বাড়ি থাকলে কুরর-র্-র্ করার আগেই লম্বা হাতে খপ্ করে রিসিভার তুলেই বলত, ইয়েস্।

পাঁচ-ছ'বার বাজার পরে গদাধর ধরলো। বলল, কে রুদ্রবাবু নাকি? নমস্কার এঁজ্ঞে।

—ঋজুদা কোথায়?

—ডাক্তারের কাছে।

—ফিরবে কখন?

—তা সময় হইয়েচে। ডাক্তারবাবু চেইঞ্জে যিতে বইল্চে।

—তাই নাকি? ঋজুদাকে বোলো। তোমাদের ওখানে যাচ্ছি। গিয়েই কথা হবে।

—এঁজ্ঞে।

—আরে গদাধরদা, এই যে; ছেড়ো না। কি রেঁধেছ?

—রান্না? সে এখন কিসের? আত্তির ন'টা বাইজ্লে তবে-না বাবুর অরডার। কোন্দিন, কখন কি খাবার ইচ্ছা কইরবেন। বুইঝলে না, খাদ্য-খাদকের ব্যাপার!

আজও জোর বৃষ্টি হয়ে গেল। তুমি ভালো করে ভুনি খিচুড়িই চাপাও দেখি, চীনা বাদাম, মটর-শুঁটি, কিস্মিস্ এসব দিয়ে।

—বুইঝলাম। সইঙ্গে আর কি কইরব?

—বেগুনী, ফুলুরি, পেঁয়াজী, মানে তোমার যত খাদ্য-খাদক আছে, সব।

ফাস্টো কেলাশ্। তবে আমি যোগাড়-যন্তর কইরগে যাই। তুমি এইসব খেইও—কিন্তু বাবু বইক্লে কিন্তুক সিটাও তুমারই খাইদ্য হবেক। সি কতা মইনে রেকো।

—মনে রাখব। করো ত' তুমি খিচুড়ির বন্দোবস্ত।

॥ ২ ॥

পুব-আফ্রিকার সেরেঙ্গেটিতে ভুবুণ্ডা গুলিতে আহত হওয়ার পর আরও যা-যা ধকল গেছিল ঋজুদার উপর দিয়ে তা সামলে ওঠা আর কারো পক্ষে সম্ভব হতো কী না জানি না। কিন্তু ঋজুদা সামলে উঠেছে। মাসাইদের সর্দার, মানে নাইরোবি সর্দারের কাছে আমাদের যা ঋণ জমা হয়েছে সে এ-জন্মে হয়ত শোধা যাবে না। কিন্তু সেসব কথা এখানে নয়। টেডিকে খুন করার আর ঋজুদার উপর গুলি চালাবার শাস্তি ভুবুণ্ডাকে পেতেই হবে। আজ আর কাল! তবে, কবে ঋজুদা আবার যাবে আফ্রিকাতে জানি না।

এবং গেলেও আদৌ নেবে কি-না আমাকে, তাও নয়। সে কারণেই, এখন থেকে বিশেষ পরিমাণে তৈলদান করে রাখছি ঋজুদাকে ; চান্স পেলেই।

বিশপ লেফ্রয় রোডের ফ্ল্যাটে যখন গিয়ে পৌঁছলাম, তখন প্রায় সাতটা বাজে। বেল দিতেই গদাধরদা এসে দরজা খুলেই ফিস্‌ফিস্ করে বলল, তোমার পেরার্থনা মঞ্জুর। বাবু বইল্‌লেন, রুদ্র বইলেচে, তা আবার আমাকে জিইগ্যেস্ কইরবার প্রেয়োজনটা কি ছেল ?

বললাম, তবে। দেখেছো ত। তুমিই কেবল পাত্তা দাও না আমাকে।

ঘরে ঢুকতেই দেখি ঋজুদা লেখাপড়ার টেবল ছেড়ে সোফায় বসে, সামনে একটা কুশান্-চাপানো মোড়ায় দু'পা তুলে দিয়ে খুব মনোযোগ সহকারে অটোমোবিল এ্যাসোসিয়েশানের মোটরিং গাইডের পাতা ওল্টাচ্ছে।

আমি ঘরে ঢুকবার পরও মুখ তুলল না। উল্টোদিকের সোফায় বসলাম যথাসম্ভব কম শব্দ করে। আরও মিনিট পাঁচেক কেটে গেল।

হঠাৎ মুখ তুলে বলল, লুলিটাওয়া আর গীমারিয়ার মাঝামাঝি। বুঝলি।

বোকার মত ঋজুদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ঋজুদা বলল, আমি কিছুই বলছি না। তুই এখন কি বলিস তার উপরই ত যাওয়া-না-যাওয়া নির্ভর করবে।

সোফা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম। বললাম, কোথায় ?

ঋজুদা হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে নিল, বোধহয় আমার উত্তেজনা বাড়াবার জন্যেই।

বলল, তুই যে খবরটা নিয়ে এসেছিস, সেটা বল্ আগে। তারপর যাওয়ার কথা হবেখন।

অবাক হয়ে বললাম, তুমি জানলে কি করে যে ; খবর নিয়ে এসেছি ?

এতটুকুই না জানলাম এতদিনে, তাহলে আর.....

বললাম, আজকে চিঠি এসেছে। আমি ন্যাশনাল স্কলারশিপ্ পেয়েছি। তবে যাদের বাবার রোজগার মাসে পাঁচশ টাকার বেশী তাদের স্কলারশিপ দেবে না। একশ টাকা প্রাইজ দেবে। আর সার্টিফিকেট্।

ঋজুদা বলল, ঐ চিঠিটাই বাঁধিয়ে রেখে দে। টাকা আর সার্টিফিকেট পেতে পেতে তোর পড়াশুনার জীবন শেষ হয়ে যাবে। হয়ত কোনোদিনও না-ও পেতে পারিস। আর এই নে। এক্ষুনি তোকে এই একশ টাকা আমিই দিলাম বোর্ড অফ সেকেন্ডারী এডুকেশনের হয়ে।

বললাম, না না, এ কি ! মা-বাবা খুব রাগ করবে।

ঋজুদা বলল, তোর পাকামি করতে হবে না। সে আমি বুঝব। তোর পছন্দমত বই কিনিস।

তারপরই বলল, তোকে বলাই হয়নি, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার নতুন এডিশান আসছে আমার লাইব্রেরীতে। একবারে পারলাম না। ইনস্টলমেন্টেই কিনলাম।

আমি বললাম, দারুণ ! আমার আর ভাবনা নেই। তবে, বারবার দৌড়ে আসতে হবে তোমার কাছে, এই যা।

ঋজুদা বলল, যাই-ই বল্ রুদ্র, আমি খুব খুশী হয়েছি। এত কম পড়াশুনা করে, আমার সঙ্গে বনে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে তোর ড' বকে যাওয়ারই কথা ছিল, তুই যখন সাতশ সাতষট্টি পেলি স্কুল ফাইন্যালে, ভেবেছিলাম টুকে-ফুকে পেয়েছিস। এখনও ব্যাপারটা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছি না। আমাদের সময়ে.....

বললাম, বিশ্বাস করতে হবেও না। তোমাদের সময়ের ব্যাপারই আলাদা। তোমাদের সময় কেউ টোকাটুকি জানত না, প্রত্যেকেই পরীক্ষায় ফারস্ট হতো।

প্রত্যেকেই কি করে ফারস্ট হয় ? ঋজুদা বলল।

তা জানি না কিন্তু আমার বন্ধুরা বলে, ওদের প্রত্যেকের বাবাই নাকি ফারস্ট হতেন, সেকেন্ড যে কারা হতেন তোমাদের সময়ে তা তোমরাই জানো।

ঋজুদা হো হো করে হেসে উঠল। তারপর বলল, এটা ভাল বলেছিস্।

কিছুক্ষণ হাসি হাসি মুখে বসে থেকে ঋজুদা বলল—আজ খিচুড়িই খা। কিন্তু পরে একদিন পোলাও-মাংস খাওয়াব। না, তার চেয়ে বিরিয়ানীই ভালো। চল্ আমার সঙ্গে মুলিমালোয়া, তোকে ফারস্ট ক্লাস বিরিয়ানী খাওয়াব।

সে জায়গাটা কোথায় ?

হাজারীবাগ জেলায়।

হাজারীবাঘ ? আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম।

—হাজারীবাঘ নয় রে ন্যাশনাল স্কলার। হাজারীবাগ। বাগ, মানে, বাগিচা।

—সরি, সরি ! আমি ভাবতাম হাজারীবাঘ।

—সাধে কি মনে হয় আমার যে, টুকে পাশ করেছিস।

—ঋজুদা ! ভালো হচ্ছে না কিন্তু।

—কলেজ কবে খুলবে ? কথা ঘুরিয়ে ঋজুদা বলল।

—বাইশে জুন।

—আজ পয়লা। ফারস্ট ক্লাস। পরশুই আমরা বেরোব। বাঁধা-ছাদা করে নে।

আমি বললাম, তোমার পা ? এখন একদম ঠিক ত' ? খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটা-হাঁটি করবে ?

একদম ঠিক কি আর হবে কখনও ? ভুষুণ্ডাকে সর্বক্ষণই মনে করতে হবে। ভুলতে দেবে না ও নিজেকে। তবে যেমন আছে এখন, সামান্য খুঁড়িয়ে-চলা ছাড়া আর কোনো অসুবিধাই ত' নেই।

রাইফেল-বন্দুক। আমি উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

একদম্ না।

ভুষুণ্ডার গুলিটা দেখছি, তোর গায়েই লাগা উচিত ছিলো। এখন এক বছর নো-রাইফেল-বন্দুক। ভুষুণ্ডা-শিকার না-করে আর কোনো শিকারের নাম পর্যন্ত নয়।

—যা বলেছো। অনুতাপের গলায় আমি বলাম।

—জামা-কাপড়, টর্চ, হাঁটার জুতো, থার্মোফ্লাস্ক্। একেবারে বেড়াতে যাওয়া—চেঞ্জার মাখমবাবুদের মত। দুজনেই শরীর গোলগাল করে আসব। শুধু খাওয়া-দাওয়া আর ঘুম।

—সঙ্গে কে যাবে ? গদাধরদা ?

কেউ নয়। শুধু আমরা দুজন।

অবিশ্বাসী গলায় বললাম, তুমি শুধুই খাবে, হাঁটবে আর ঘুমোবে ? সত্যি সত্যি ?

ব্যস্স্—স্-স্..... । বললামই ত'।

—তাহলে আমি যাবো না।

—তোকে যেতেই হবে। আফটার অল, তুই হলি গিয়ে আমার সোডিয়র। আফ্রিকার সেরেঙ্গেটি থেকে আমায় বাঁচিয়ে আনলি তুই—তোকে ফেলে রেখে আমি একা স্বাস্থ

ভালো করতে যেতে পারি ? আমাকে কি এতই অকৃতজ্ঞ ভাবিস।

দুস্স্ বন্দুক-রাইফেল ছাড়া গিয়ে লাভ কি ? খালি-খালি লাগে।

আরে, চলই না। বর্ষাকালের সাঁওতাল পরগণার যা চমৎকার ওয়েদার ! কোথায় লাগে সুইট্জারল্যান্ড।

এমন যা-তা বলো না তুমি।

আরে ! ঠাট্টা নয়। সত্যি বলছি।

—আমরা যাব কিসে ?

—কেন ? গাড়িতে ?

—কে চালাবে ? তুমি ? ডাক্তার সেন না মানা করেছেন !

—ডাক্তারদের সব কথা কক্ষনো শুনতে আছে ? সব কথা শুনেছিস কী মরেছিস !

তারপর বলল, না-হয় তুই-ই চালাবি। গাড়ি ছাড়া ঐ অঞ্চলে গিয়ে মজা নেই।

—থাকব কোথায় ?

—তুই ত' মহা ঝামেলা করিস। বলছি না, চুপচাপ থাক। যাচ্ছিস আমার সঙ্গে, তোর কিসের মাথাব্যথা ?

তারপর হেসে বলল, তোকে কষ্ট দেবো না। রুদ্রবাবু বলে ব্যাপার।

আমি চুপ করে গেলাম।

ঋজুদা বলল, এক কাজ কর্ ত'। দ্যাখ, ঐ ডানদিকের ড্রয়ারে একটা ক্যাসেট আছে। চণ্ডীবাবুর। বের করে, টেপ-রেকর্ডারে লাগা।

—কে চণ্ডীবাবু ?

—আরে চণ্ডীদাস মাল। গুণী লোক। নিধুবাবুর টপ্পা টেপ করা আছে। নিধুবাবুর শিষ্য ছিলেন কালীপদ পাঠক। আর কালীপদ পাঠকের শিষ্য চণ্ডীদাস মাল। তোরা ত' এসব শুনবি না। শুধু বনি এম্, বী-জীস্ আর দ্যা পোলিস্।

আমি বললাম, আমাদের উদারতা আছে। আমরা তোমাদের মত নই। খারাপ বলি না কিছু। আমাদের কাছে টাকও ভালো ; টিকিও ভালো।

গদাধর এসে বলল, টেবল লাইগে দিচি।

খেতে বসেই ঋজুদা বলল, তোর জন্যে আজ সারা রাত ঢক্ ঢক্ করে জল খেয়েই মারা যাব। কোলকাতা শহরে পয়লা জুন আকাশে মেঘ দেখেই যে কেউ খিচুড়ি খেতে পারে তা আমার জানা ছিলো না। এ রকম বর্ষামঙ্গল ভাবা যায় না। ভ্যাপসা গরমের মধ্যে কাউকে জোর করে খিচুড়ি খাওয়ানোর মত শাস্তিও বোধ হয় আর কিছুই হয় না। ধন্য তুই। আর ধন্য তোর খেচুড়ি !

বলল : বৃষ্টিটা নেমেও যে আবার উঠে পড়ল। এমন করবে তা কি করে জানব ? সন্ধের দিকে আকাশের অবস্থা যে রকম ছিল তাতে ত' মনে হয়েছিল...

—ঋজুদা হেসে বলল, যাকগে আজকে তোকে মাপ করা গেল। আকাশকেও তোর ন্যাশনাল স্কলারশিপের খাতিরে ভবিষ্যতে কখনও আর এমন শাস্তি দিস না।

॥ ৩ ॥

কাল রাতে আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি। আজকাল জি টি. রোডে গাড়ি চালানো মহা ঝক্মারি। বিশেষ করে বরাকর অবধি। বরাকরের ব্রিজের উপর এমন ট্রাফিক জ্যাম যে মাইথন হয়ে ঘুরে আসতে হল। তাছাড়াও পথে থামতে থামতে এলাম।

গোবিন্দপুরের মোড়ের খান সাহেবের চটিতে লাঞ্চ। বাগোদরে জি. টি. রোড ছেড়ে এসে চাটিজারিয়ার পণ্ডিতজীর দোকানে কালোজাম আর নিমকি দিয়ে চা। তারপর হাজারীবাগ শহর ছাড়িয়ে গীমারীয়ার পথে এগিয়ে এসে যখন অনেক রাতে এই বিরাট, গা-ছমছম্ পুরনো দুর্গের মত বাড়িটাতে পৌঁছলাম—গভীর জঙ্গলের মধ্যে, মেঘে-ঢাকা আকাশের থমথমে অন্ধকারে, তখন বিশ্বাস করতে রীতিমত কষ্টই হল যে, আজই সকালে কোলকাতা থেকে বেরিয়েছিলাম আমরা।

ঘুম থেকে উঠে চা খেয়ে বাড়িটার চার পাশে ঘুরে ঘুরে দেখছি। জায়গটার নাম মুলিমালোয়াঁ। লুলিটাওয়া আর গীমারিয়ার মাঝামাঝি। এই পুরনো দুর্গের মত বাড়িটার নাম মালোয়াঁ-মহল মুলিমালোয়াঁর রাজার বাড়ি। বাড়িটাতে পুরনো দিনের বড় বড় গোল খিলান, শিকবিহীন বিরাট বিরাট জানালা, প্রকাণ্ড চওড়া সাদা মার্বেলের বারান্দা। আর ঘরগুলো ত' ফুটবল খেলার মাঠ। ল্যাজারার্স কোম্পানীর বানানো মেহগিনী কাঠের পোল্লায় খাট। তার গায়ে কত সব কারুকার্য। অন্য ফার্নিচারও সব দেখার মত। চোখ জুড়িয়ে যায়।

কিন্তু সারা বাড়িতেই কেমন যেন একটা অগোছালো, অভিশপ্ত ভাব। সব থেকেও যেন কিছুই নেই। বাড়িতে কোনো মেয়ে নেই, তাই-ই বোধহয় এ রকম অলক্ষ্মী-অলক্ষ্মী ভাব। একজন কেউ থাকলেও সব কিছু গোছগাছ করে রাখতেন হয়ত !

খাটের মাথার উপরে ফিনফিনে নেটের গোল মশারী। কিন্তু যা আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল, তা হচ্ছে কোলবালিশ। মখমলের ঢাকনা-পরানো। পাশে রাখলে পাশে শোওয়া লোককে দেখাই যায় না।

আমাদের দুজনের জন্যে দুটো আলাদা ঘর বরাদ্দ হয়েছে। সেজের বাতি। টানা পাখা। মনে হচ্ছে, যেন হঠাৎ ভুল করে কোনো রূপকথার রাজত্বেই চলে এসেছি।

বিষেণদেওবাবুর মত লোক হয় না। যেমন রাজার মত চেহারা। মস্ত বড় কাঁচা-পাকা গোঁফ। ছ'ফিট লম্বা—শক্ত সমর্থ। আর তেমনি অতিথিবৎসল।

পরিবেশ ভারী চমৎকার বাড়িটায়। কিছুদুর এগিয়ে গেলেই ওড্ড-রাতুরা রোড। লাল মাটির রাস্তা। দু' পাশ ঘন বনে ঢাকা। বাড়ির সামনে দিয়েই গীমারিয়া হয়ে লাল মাটির রাস্তাটা সোজা চলে গেছে ভালুয়া মোড়। ভালুয়া মোড় থেকে বাঁয়ে গেলে পালামৌর চান্দোয়া-টোড়ি আর ডাইনে গেলেই রাড়রা।

ঝাড় লণ্ঠনের নীচে—রুপোর বাসনে—বিরাট বিরাট মাদুরের তৈরি টানাপাখার ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়ায়, মেঝেতে, রাজস্থানী কাজ-করা আসনে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে যে রাজকীয় ডিনার খেয়েছিলাম কাল রাতে, আগে তেমন কখনই খাইনি। বিষেণদেওবাবু খুব যত্ন করে আমাদের খাওয়ালেন। ভানুপ্রতাপ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। বিষেণদেওবাবু বললেন, ভানুটা এখনও একেবারে ছেলেমানুষ। দিনভর রোদে রোদে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়। আপনাদেরও গাড়িতে আসার কথা ; কখন আসবেন ঠিক কি ? তাই আমিই বললাম, শুয়ে পড়তে। আমার জঙ্গলে এত শিকার। শিকারও খেলে না ও। বিষেণদেওবাবুর গলায় দুঃখের ছোঁয়া লাগল।

—শিকার ? আমি চোখ বড় বড় করে বলেছিলাম।

জী-হাঁ। বিষেণদেওবাবু বলেছিলেন।

ঋজুদা আমার দিকে ফিরে বলেছিল, জী একদম না ! শিকারের নামগন্ধও নয়।

বিষেণদেওবাবু বললেন, ই কোঈ বাত্ হুয়া ! আমার জমিদারীতে আপনি এলেন,

একদিনও শিকার খেলবেন না ? ভানু ত' আপনারা আসবেন শুনে খুব খুশী। ইন্তেজাম করে রাখা হয়েছে।

ঋজুদা ওঁকে নিরস্ত করে বললেন, খেলব না বলেই ইচ্ছে করেই আমরা বন্দুক-রাইফেল পর্যন্ত আনিনি।

উনি বললেন, বন্দুক রাইফেল কা কোঈ কমী হ্যায় হামারা মুলিমালোয়াঁমে ? কাল সকালে আমাদের বন্দুক-রাইফেলের কালেক্‌শান দেখাব আপনাদের। যা আছে, তা দিয়ে একটা যুদ্ধ লড়া যায়।

ঋজুদা আবারও বলেছিলো, আপনার আমরি দেখতে দোষ নেই। নিশ্চয়ই দেখব। কিন্তু ঐ খালি দেখাই। শিকারের কথা একেবারেই নয়। তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, শিকার ছেড়েও দিয়েছি আমি বহুদিন।

—উনি বললেন, এটা ত' আমারই রাজত্ব। এখানের রাজা আমি। এখানে অন্য কারোই আইন-কানুন চলে না। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের আমলেও চলেনি, এ গভর্নমেন্টের আমলেও চলবে না। আমাদের আইন এখনও আমরাই বানাই। আমরাই ভাঙি।

ঋজুদা আর কিছু বলেনি। ওয়ার্লড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ডের হোমরা-চোমরারা ঋজুদাকে চিফ গেম-ওয়ার্ডেন বানানোর জন্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের চিফ কনসার্ভেটরকে লিখেছেন। ঋজুদার বিপদটা আমি বিলক্ষণ বুঝতে পারছি। কিন্তু বিপদ ঋজুদার। আমার ত' নয়। আমি মনে মনে নেচে উঠেছিলাম। একদিন শিকার করলে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে ? তাছাড়া, বিষেণদেওবাবু আর ভানুপ্রতাপ নিশ্চয়ই পট-হান্টিং করেন। স্রেফ, নিজেদের খাওয়ার জন্যেই সামান্য কিছু......

বিষেণদেওবাবু হাসিহাসি মুখ করে ঋজুদার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, আপনাকে এমন একটা খবর দেবো এখন যে, শুনে আপনার তাক লেগে যাবে। শুনলেই রাইফেল তুলে নেবেন হাতে।

—কি খবর ? ঋজুদা এমন ভাবে বলল যেন উত্তেজনাকর কিছু শুনতেই চায় না।

বিষেণদেওবাবুর হাসিটা প্রথমে দু' চোখের মণিতে ঝিলিক মারল, তারপর তাঁর তেল চুকচুক ফর্সা গালে পিছলে গেল, এবং তারপরই তাঁর সারা শরীরে ঝাঁকুনী তুলল।

হাসি থামলে, বিষেণদেওবাবু বললেন, অ্যালবিনো।

অ্যালবিনো ? টাইগার। বলেন কি ?

জী হাঁ। হাসতে হাসতে বিষেণদেওবাবু বললেন। তারপর বললেন, মামুলী কোনো শিকারের দাওয়াত দিচ্ছি না আপনাকে। আ চান্স ইন আ লাইফ-টাইম। সারা পৃথিবীতে অ্যালবিনো ট্রোফি কতজনের আছে ঋজুবাবু ? আপনিই বলুন।

অ্যালবিনোর কথা শুনে লজেন্স খেতে মানা বাচ্চা ছেলেকে লজেন্স দিলে তার মুখের ভাব যে রকম হয়, ঋজুদার মুখের ভাবও তেমন হল। মজা লাগল দেখে।

জব্বর তীর ছুঁড়লেন একখানা বিষেণদেওবাবু এবং ঋজুদা সেই তীরে বিদ্ধ হলো।

প্রথমত, অ্যালবিনো ব্যাপারটা আমি বুঝলাম না। দ্বিতীয়ত, বিষেণদেওবাবু আফ্রিকা-ফেরত, ওয়াল্ডারাবো এক্সপার্ট আমা-হেন একজন তালেবর ব্যক্তিকে মোটে মানুষ বলেই গণ্য করছেন না দেখে লোকটার উপর ভীষণ বিরক্ত হলাম আমি। বিরক্ত হলাম বলেই অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে রইলাম।

শুতে যাওয়ার আগে ঋজুদা বলছিল, মালোয়াঁ-মহলের বাসিন্দা রাজা বিষেণদেও সিং ও তার ভাগ্নে ভানুপ্রতাপ। মাত্র এই দুজন। লোক দুজন হলে কি হয় ? চাকর, বেয়ারা,

দারোয়ান, খিদমদ্‌গার একেবারে গিস্‌গিস্ করছে। জমিদারী চলে গেলেও এঁদের সম্পন্নতার কোনোই হেরফের হয়নি। কারণ জমিদারী থাকতে থাকতেই এঁরা কোডারমা ঝুমরীতিলাইয়া অঞ্চলে বেশ কিছু মাইকা মাইনস্ কিনে ফেলেছিলেন। বিষেণদেওবাবু আর তার ভগ্নীপতি মানে ভানুপ্রতাপের বাবা মিলে। খনিগুলো বিশ্বাসী ম্যানেজারেরা দেখাশুনা করেন। গত কয়েক বছরে মাইকা এক্‌সপোর্ট করে এঁরা কোটিপতি হয়ে গেছেন। মাসে এক দু'বার গিয়ে অভ্র খনিগুলো দেখাশোনা করে আসেন বিষেণদেও। ভানুপ্রতাপ লান্ডান পড়তে গেছিল। কিন্তু পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে গত চার মাসের উপর এখানেই মামার কাছে এসে আছে। ভানুপ্রতাপও উত্তর প্রদেশের খুব অবস্থাপন্ন পরিবারের লোক।

কী একটা পাখি ডাকছে বাঁ দিকের জঙ্গল থেকে। কী পাখি তা দেখার জন্যে পথ ছেড়ে আস্তে আস্তে ঢুকে গেলাম জঙ্গলে। আহা ! দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। কী সুন্দর যে পাখিটা। এই পাখি আমি কখনও দেখিনি আগে। বাড়ি ফিরে সালিম আলীর বই দেখতে হবে। গাঢ় লালের মধ্যে ফিকে হলুদ। গলার স্বর সাঁওতাল ছেলের বাঁশীর মত মিষ্টি।

কাল মাঝরাতে এখানে বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশে এখনও মেঘ। গরম একেবারেই নেই। বেশ একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। ঋজুদা ঠিকই বলেছিল। ঝির্ ঝির্ করে হাওয়া দিচ্ছে। বাঁশ পাতায়, শালের বনে, পিটিপিটিয়া, রাহেলোওলা, জীরহুল্ আর ফুলদাওয়াইর ঝাড়ে-ঝাড়ে যে এই বিকশ বিবাগী হাওয়া ফিস্‌ফিস করে কত কী কথাই বলে যাচ্ছে।

দূরাগত একটা গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ কানে এলো। ঋজুদা কি আমাকে ফেলে কোথাও চলল একা একা ? ভারী খারাপ ত'। কিন্তু ভাল করে শুনেই বুঝলাম, এঞ্জিনের আওয়াজটা জিপ্সি গাড়ির নয়। তবে এ্যাম্বাসাডর বা জীপেরও নয়। যতক্ষণে জঙ্গলের ভিতর থেকে আমি আবার লাল মাটির চওড়া পথটাতে এসে পৌঁছেছি, ততক্ষণে গাড়িটাও এসে পৌঁছে গেল কাছাকাছি।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম এই গভীর জঙ্গলে একটা আকাশী-নীলরঙা বিদেশী টুওয়ার গাড়ি দেখে। গাড়িটা একেবারে আমার কাছে এসেই থেমে গেল, লাল ধুলোর হালকা মেঘে জায়গাটা ঢেকে দিয়ে। গাড়ির স্টিয়ারিং ছেড়ে দরজা খুলে একজন ইয়াংম্যান লাফিয়ে নামলেন। বয়স এই কুড়ি-বাইশ হবে। লম্বা, ফর্সা, কাটা-কাটা চোখ মুখ নাক। সরু একজোড়া প্রজাপতি-গোঁফ। খুব সুন্দর চেহারা, কিন্তু চোখের নীচে কালি, বড় ক্লান্তি সারা মুখে।

গাড়ি থেকে নেমেই, আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, হাই।

আমিও বললাম, হাই। ইয়াংম্যান নিজের পরিচয় দিলেন।

বললেন, আমারই নাম ভানুপ্রতাপ সিং। সরি, কাল ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মামাবাবুর কাছ থেকে আপনারা আসবেন এ খবর শুনেছি অনেকদিন হল। এতদিনে এলেন।

তারপর আমার উত্তরের অপেক্ষা না-করেই বললেন, আমি একটু যাচ্ছি গীমারীয়াতে। উঠে পড়ুন ভাইসাব। ঘুরে আসি। কখনও দ্যাখেননি ত গীমারীয়া ?

ভানুপ্রতাপের অমায়িক সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমার নিজের এরকম একটা গাড়ি থাকলে আমার মত যার-তার সঙ্গে কথাই বলতাম না আমি।

উনি আবার বললেন, কি হল ? যাবেন না ?

বললাম, না, যাব। কিন্তু ঋজুদা ?

আরে উনি এখন মামাবাবুর সঙ্গে গল্পে মশগুল। চলুন না, যাব, আর আসব।

গাড়িতে ঢুকতেই একটা গন্ধ নাকে এল।

আমাকে নাক টানতে দেখেই উনি বললেন, ঈত্তর। খস্‌স্‌ ঈত্তর স্প্রে করাই আমি আমার গাড়িতে। গরমে খস্‌স্‌ আর শীতে অম্বর।

আতরের গন্ধ ছাপিয়ে একটা বোঁটকা গন্ধ নাকে আসতে লাগল আমার। গন্ধটা যে ঠিক কিসের বুঝতে পারলাম না। কিন্তু আতরের গন্ধও সেই গন্ধটাকে চাপা দিতে পারেনি পুরোপুরি।

সামনের সীটে ওঁর পাশেই উঠে বসলাম। গাড়ি স্টার্ট করার আগে, রুপোর ফ্লাস্ক থেকে জল ঢেলে উনি পকেট থেকে দুটো বড়ি ফেললেন মুখে।

জিজ্ঞেস করলাম, শরীর খারাপ ?

—না ত' !

—তবে ?

—ও আমি খাই। এমনিই খাই।

তারপর আমার দিকে ফিরে হেসে বললেন, নাশা।

নেশা ? তাহলে গাড়ি চালাবেন কি করে ?

ভানুপ্রতাপ হাসলেন। বললেন, না খেলেই বরং চালাতে পারি না। আদত্ বৈঠে গ্যয়া।

একটু থেমে বললেন, আমার মামাবাবুই নেশাটা ধরিয়েছেন বলতে গেলে।

সে কি ? আমি অবাক হয়ে বললাম।

ভানুপ্রতাপ বললেন, আমার বাবা এবং মায়ের মৃত্যুটা এতই হঠাৎ হল যে, সেই ধাক্কাটা সামলেই উঠতে পারছি না, পারিনি এখনও। হয়ত পারবো না কখনও। আগে ত' রাতে একেবারেই ঘুম হতো না। মামাবাবু বলতেন, রাতে ঘুম না হলে মানুষ বাঁচে কখনও ? রাতের ঘুমের জন্যে ওষুধ খাওয়াটা দোষের নয়। সেই যে শুরু হল, এখন মুঠো মুঠো খাই। হরওয়াক্ত। ঘুমুবার জন্যে নয়—খেতে ভালো লাগে বলে। না-খেলেই বরং ঘুম পায়। গা ম্যাজম্যাজ করে।

মনে হল ঋজুদার কাছে যেন শুনেছিলাম যে ভানুপ্রতাপ লান্‌ডান্‌ থেকেই এই নেশা সঙ্গে করে এনেছেন। কিন্তু ভানুপ্রতাপ নিজে অন্য কথা বলছেন !

দেখে বললাম, অবাক কাণ্ড ! মামাবাবুর ত' এর জন্যে আপনার উপর রাগই করা উচিত !

না, না ! এমন মামা হয় না। তাছাড়া, উনি ছাড়া এখন ত' আমার কেউই নেই। উনিই হয়ত রাগ করতে চাইলেও আমার উপর রাগ করতে পারেন না। আমার বাবাকে হারিয়েছিলাম তিনমাস আগে। মা-ও গেছেন দু'মাস হলো। এখন উনিই আমার মা-বাবা সব। কী যে হয়ে গেল।

বেচারা ! আমি ভাবলাম।

গাড়ি চলছিল।

গাড়ি চলছিল গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। সামনে দিয়ে একদল ময়ূর রাস্তা পার হলো। তারপর পার হলো বাঁদরের একটি পুরো পরিবার। বোধহয় তিনপুরুষ।

আমি ভানুপ্রতাপের দিকে তাকালাম। একটা জিন-এর শর্টস্‌ আর গায়ে টেনিস খেলার হলুদ-রঙা ফ্রেড্‌-পেরী গেঞ্জী। পায়ে হালকা রাবার সোলের চটি। মাঝে মাঝেই রুপোর

ফ্লাস্ক টা হাতে তুলে ধরে জল খাচ্ছেন ডান হাত গাড়ির স্টিয়ারিং-এ রেখে। জলের সঙ্গে কিছু মেশানো আছে কি-না কে জানে ?

বললাম, আপনার মামাবাবু আর ঋজুদা কি এত গল্প করছেন ?

ছুলোয়া শিকার হবে। বোধহয় তারই ইন্তেজাম হচ্ছে।

সত্যি ? এখানের জঙ্গলের কি কি জানোয়ার আছে ? শুধোলাম আমি।

বড় জানোয়ার এখন আর তেমন নেই বললেই চলে। তবে, লেপার্ড আর ভাল্লুক অনেক আছে। চিতল আছে। শম্বর আছে। শুয়োর, শজারু, খরগোস, নেকড়ে এইই সব। একসময় এদিকে হাতী, বড় বাঘ, বাইসন, নীলগাই এসব খুবই ছিল। একেবারেই দেখা যায় না আজকাল।

আমি বললাম, বিষেণদেওবাবু নিশ্চয়ই অনেক বাঘ মেরেছেন ? আর আপনি ?

বড় বাঘ ত' মামাই মেরেছেন ছত্রিশটা। আর আমি পাঁচটা। তবে, আমাদের জঙ্গলে অ্যালবিনো টাইগার এসেছে একটা। এ একটা খবরের মত খবর।

মনে মনে ভাবছিলাম, খুবই খারাপ আপনারা মামা ভাগ্নে দুজনে মিলেই ত' বাঘের বংশ নাশ করে ফেলেছেন, অন্যদের আর কি দরকার ছিল ! কথা ঘুরিয়ে বললাম, আপনার ত' ওষুধ খাবার নেশা। বিষেণদেওবাবুর নেশা কি ?

—মামাবাবুর ?

বলেই, ভানুপ্রতাপ একটুক্ষণ ভাবলেন।

তারপর বললেন, কোনো নেশাই নেই। মামাবাবু ভগবান। তবে একটা নেশা আছে, যদি সেটাকে নেশা বলা যায় ; সেটা টাকার নেশা। এর চেয়ে বড় নেশা আর কিছু নেই।

গীমারীয়া পৌঁছে, বি-ডি-ও-র অফিসে গিয়ে ঢুকলেন ভানুপ্রতাপ। আমাকে বসতে বললেন গাড়িতেই। অমন ঝক্‌ঝকে গাড়ি দেখে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা ছেঁকে ধরল গাড়িটাকে। এমন গাড়ি কোলকাতাতেই দেখতে পাই না আমরা ত' এরা আর কোত্থেকে দেখবে ?

একটু পর ফিরে এলেন ভানুপ্রতাপ। তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে নিলেন মুলিমালোয়ার দিকে।

আমি বললাম, আপনারা ঋজুদাকে চিনলেন কি করে ?

ভানুপ্রতাপ বললেন, সে মামার সঙ্গে ভাব। আমি এই প্রথম দেখলাম ওঁকে। কোডারমাতে মাইকা কোম্পানীর মাইকা মাইন্স আছে। রামকুমার আগরওয়ালার আমল থেকে মামাবাবুর সঙ্গে আপনার ঋজুদার আলাপ। শুনেছি, তখন রজৌলির ঘাটে আর শিঙ্গারে খুব শিকার খেলতেন দুজন একসঙ্গে। সে আজ থেকে তিরিশ বছর আগের কথা। আমরা জন্মাইওনি।

তাই বুঝি ? আমি বললাম।

বাড়ির বিরাট গেটের মধ্যে গাড়ি ঢুকতেই ফটাফট্‌ সেলাম বাজতে লাগল চারপাশ থেকে। গেটের মধ্যে ঢুকেই গাড়িটা গোঁ গোঁ শব্দ করে থেমে গেল। আমরা দুজনে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করলাম। ভানুপ্রতাপ নেমে বনেট খুললেন। আমি গিয়ে এটা ওটা ধরে টানাটানি করতেই উনি বললেন, ছোড়ো ইয়ার্। যিস্‌কা বান্দরী, ওহি নাচায়।

আমি লজ্জা পেলাম। যিস্‌কা বান্দরী ওহি নাচায় মানে, যার বাঁদর সেই-ই শুধু তাকে নাচাতে পারে। ভানুপ্রতাপের গাড়ি, আমার কথা শুনবে কেন ?

একটু পরই উনি স্টিয়ারিং-এ এসে আবার বসতেই গাড়ি কৈ কৈ করে কথা বলে উঠল। ভানুপ্রতাপ আমার দিকে চেয়ে হাসলেন একটু।

পোর্টিকোতে গাড়ি রাখতেই উর্দি-পরা ড্রাইভার এসে গাড়ি গ্যারাজে নিয়ে গেল। সামনে দাঁড়ানো বেয়ারাকে ভানুপ্রতাপ শুধোলেন, মামাবাবু কাঁহা ?

সে বলল, মাল্‌খানায়।

ভানুপ্রতাপ আমাকে নিয়ে একতলার পিছন দিকের একটি বিরাট ঘরে গিয়ে পৌঁছলেন। পুরু কার্পেটে-মোড়া ঘর। মেঝেতে কার্পেটের উপর বসে চারজন লোক, পলিথিনের শিট্ বিছিয়ে বন্দুক-রাইফেলে তেল লাগাচ্ছে, ব্যারেল পরিষ্কার করছে। ঘরটা ঋজুদার পাইপের এ্যাম্ফোরা তামাকের ধোঁয়ার গন্ধে ভুরভুর করছে।

আমরা ঢুকতেই বিষেণদেওবাবু বললেন, ভানু, তোর রাইফেল-বন্দুক বেছে রাখ্ দশেরা শিকারের জন্যে। তোর ইন্তেজাম, তুইই বে-পাত্তা।

তারপর বললেন, ঋজুবাবুকে কেন দাওয়াত দিয়ে আনিয়েছি আমরা সে কথা ভাল করে জানিয়ে দে।

ভানুপ্রতাপ কাঁচের আলমারী খুলে সারসার রাইফেল-বন্দুকের দিকে চোখ রেখে অন্যমনস্ক গলায় বললেন, তুমি বলোনি ?

বলিনি যে তা নয়, মুলিমালোয়াঁর জঙ্গলে একটা অ্যাল্‌বিনো বাঘ এসেছে শুধু এইটুকুই বলেছি।

ঋজুদা বলল, সত্যি আশ্চর্য বিষেণদেওবাবু। সেদিন গ্রান্ড হোটেলে আপনার সঙ্গে হঠাৎ যখন দেখা হয়ে গেল তখন ত' আমাকে কিছুই বলেননি। শুধু বলেছিলেন, মুলিমালোয়াঁতে এসে ক'দিন থাকলে চুপচাপ, শরীর একদম সেরে যাবে। পায়ের চোটের কথাও ভুলে যাবেন।

বিষেণদেও সিং হাসলেন।

বললেন, তখন কি আমি নিজেও জানতাম অ্যাল্‌বিনোর কথা ?

বিষেণদেওবাবুকে বললাম, অ্যাল্‌বিনো বাঘ কিরকম দেখতে হয় ?

উনি বললেন, "অ্যাল্‌বিনো" শব্দটি এসেছে লাতিন "অ্যাল্‌বাস্" শব্দ থেকে। অ্যাল্‌বাস বা অ্যাল্‌বিনো মানে হচ্ছে সাদা। হলুদ, লাল, বাদামী অথবা কালো রঙের অনুপস্থিতিতে কোনো কোনো জানোয়ারের রঙ সাদা হয়ে যায়। ঐ সব জানোয়ারের পক্ষে তাদের স্বাভাবিক পটভূমিতে বেঁচে থাকা কঠিন হয় কারণ তাদের ক্যামোফ্লেজ করার ক্ষমতা থাকে না। অন্যান্য রঙের অনুপস্থিতির কারণ অনেক, সে সম্বন্ধে জ্ঞানের তোমার আপাতত প্রয়োজন নেই। অ্যাল্‌বিনিজম্ একটি রোগ। মানুষের মধ্যেও যেমন শ্বেতী একটি রোগ, জানোয়ারদের মধ্যেও তাই। তবে মানুষের অ্যাল্‌বিনিজম্ হয় 'মেলানিন্'-এর অনুপস্থিতিতে। ঘোড়া, কাক, এবং আরো নানা জানোয়ার এবং পাখিকে অ্যাল্‌বিনো হতে দেখা যায়। অ্যাল্‌বিনো বাঘের প্রজন্ম নানা চিড়িয়াখানাতে এবং ব্যক্তিবিশেষের তত্ত্বাবধানেও গড়ে উঠছে আজকাল। তবে, জংলী বাঘের মধ্যে অ্যাল্‌বিনো এখনও অতি দুর্লভ। এবং যুগযুগান্ত থেকে শিকারীদের কাছে অ্যাল্‌বিনো বাঘের আকর্ষণ যে অত্যন্ত তীব্র একথা শিকারিমাত্রই জানেন। তবে, মুলিমালোঁয়ার অ্যাল্‌বিনো এখন কার গুলি খেয়ে মরবে, তা একমাত্র বজরঙ্গবলীই বলতে পারেন।

ছোট্টু ! ভানুপ্রতাপ ডাকলেন।

ছোট্টু বলে একটি পনেরো-ষোলো বছরের সাদা পোশাক পরা খুব স্মার্ট সুশ্রী বেয়ারা

ঘরে এলো। মনে হল, এই ভানুপ্রতাপের খাস্ বেয়ারা।

ভানুপ্রতাপ যেন, গররাজী হয়ে বললেন, টুয়েল্‌ভ বোর ওভার-আন্ডারটা বের কর।

কোনটা হুজৌর ? ব্যারেটটা ?

হ্যাঁ। ব্যারেটটা।

বিষেণদেওবাবু বললেন, আমি ভাবছি প্যারাডক্সটা নেব। বলে, নিজেই আলমারী থেকে বের করলেন, টেনে। তার আগে কখনও প্যারাডক্স দেখিনি আমি। হাতে নিয়ে একটু নেড়ে-চেড়ে দেখলাম। জীবন সার্থক হল। প্যারাডক্স হচ্ছে এক মজার বন্দুক-কাম রাইফেল। দেখতে, শট্‌গানের মত কিন্তু দু' ব্যারেলেরই শেষের কিছুটা জায়গাতে গুল্ড কাটা থাকে। বুলেট ফায়ার করলে, তার রেঞ্জ বেড়ে যায়, ভেলোসিটি বেড়ে যায় তাই অনেক দূর অবধি গুলি পৌঁছয়। প্যারাডক্সের গুলিও আলাদা। দারুণ জিনিস।

ঋজুদা বলল, রুদ্র, তুই কি নিবি ?

আমি যেন খুবই নিরুৎসাহ হয়েছি এমন মুখ করে বললাম, আমাকে একটা শট্‌গানই দাও।

কত বোরের ? টুয়েল্‌ভ বোর ?

হ্যাঁ।

কি বন্দুক নিবি বল ? দ্যাখ্ এখানে পৃথিবীর সব বাঘা-বাঘা বন্দুকের গাদা। চার্চিল, জেমস্—পার্ডি, গ্রীনার ; যা চাস্। ইটস্ ফর ইওর আস্কিং।

আমি বললাম, বত্রিশ-ইঞ্চি ব্যারেলের কিছু আছে ?

আছে। বিষেণদেওবাবু বললেন।

তারপর বললেন, তুমি তাহলে গ্রীনারই নাও।

ভানুপ্রতাপ হঠাৎ বললেন, মামাবাবু বাঘটা তুমি নিজে দেখেছো ?

নিজে দেখিনি। তবে, বাঘটা পুরুষ। মনে হয়, সাড়ে-ন'ফিট পৌনে-দশ ফিট মত হবে।

ওভার দ্যা কার্ভস না বিটুইন পেগস্ ? আমি বললাম, ওঁদের মুখের কথা কেড়ে। পাণ্ডিত্য দেখাতে গিয়ে। ঋজুদা আর বিষেণদেওবাবু ত' হাসলেনই এমনকি ভানুপ্রতাপও হেসে উঠলেন আমার কথা শুনে।

ঋজুদা বলল, বাঘ মারা পড়লে তখনই মেপে দেখা যাবে। বিষেণদেওবাবু ত' আর বাঘকে দাঁড় করিয়ে টেপ দিয়ে মাপেননি। পাগ-মার্কস দেখে একটা আন্দাজ করেছেন। সেটা সবসময় এ্যাকুরেট হতে নাও পারে।

আসলে, শিকারীরা বাঘ দু'রকম করে মাপেন ; মারার পর। বাঘকে লম্বা করে শুইয়ে তার মাথার কাছে একটা খোঁটা আর লেজের ডগাতে আরেকটা খোঁটা পুঁতে তার দৈর্ঘ্যের মাপকে বলে, বিটুইন দ্যা পেগস্। আর নাকের ডগা থেকে শুরু করে বাঘের গায়ের উপর দিয়ে মাপবার ফিতেকে গায়ের সঙ্গে লাগিয়ে লেজের ডগা অবধি নিয়ে এলে তাতে যে মাপ হয় ; তাকে বলে ওভার দ্যা কার্ভস্। স্বাভাবিক কারণে একই বাঘের দৈর্ঘ্য ওভার দ্যা কার্ভস্ মাপলে বিটুইন দ্যা পেগস্-এর মাপের চেয়ে একটু বেশীই হয়।

বোকার মত কথা বলার আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠে আমি ঋজুদাকে বললাম, তুমি কি নেবে ? রাইফেল না বন্দুক ? তুমি নিশ্চয়ই রাইফেলই নেবে ?

ঋজুদা বলল, নাঃ। ভাবছি, বন্দুকই নেবো ফর আ চেঞ্জ। বুঝলি।

তারপর বিষেণদেওবাবুকে বলল, সবচেয়ে ছোট ব্যারেলের শট্‌গান কি আছে ?

আপনার কাছে ? টুয়েল্‌ভ বোরের ?

বিষেণদেওবাবু বললেন, স্কিট্ গান আছে। একেবারে চব্বিশ-ইঞ্চি ব্যারেলের। ইটালিয়ান, ব্যারেটা। ডাবল ব্যারেল।

ঋজুদা বলল, তাহলে আমি ঐটাই নেবো। মাচায় বসে ছোট্ট ব্যারেলের বন্দুক ম্যানুভার করাই সোজা।

মনে মনে ভাবছিলাম, কোলকাতার বাইরে বেরোলেই ঋজুদার কোমরে সবসময় যে পয়েন্ট-থ্রি-সেভেনটিন্ এ্যামেরিকান কোল্ট পিস্তলটা বেল্টের সঙ্গে বাঁধা থাকে, কাছ থেকে তারই এক ঘা কানে-মাথায় ঠুকে দিতে পারলে বাঘ বাবাজীর আর দেখতে হবে না। বাবা গো বলে ঐখানেই পটকে যাবে। তবে, আমি এমনি বাঘের কথা বলতে পারি। এমন সাহেব বাঘ ত' কখনও দেখিনি।

বিষেণদেওবাবু বললেন, চলুন চলুন নাস্তা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো বোধহয় এতক্ষণে। চল্ ভানু!

আমরা সকলে খাওয়ার ঘরে এলাম। মহারাজ গরম গরম বাটি ঘিয়ে ভাজা পরোটা ভেজে দিতে লাগল। সঙ্গে আলুভাজা, শজারুর চচ্চড়ি, তিতিরের বটি-কাবাব, বটেরের রোস্ট আর কমপক্ষে দশ রকমের আচার। চারজন খেতে বসেছি, চারজন লোক সার্ভ করছে। সে এক এলাহী কাণ্ড।

ঐসব শেষ করার পর, এলো বেনারসী প্যাঁড়া আর বেনারসী রাবড়ি।

ঋজুদা বিষেণদেওবাবুকে বললেন, মশায়, আপনার মতলব ত' কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাকে আর রুদ্রকে কালকেই শুইয়ে ফেলে ওভার দ্যা কার্ডস্ মাপবেন নাকি ? এমন করে খেয়ে মরার চেয়ে ত' গুলী খেয়ে মরাও ঢের ভালো ছিল, যদিও গুল্লী মোটেই সুখাদ্যর মধ্যে গণ্য নয়।

বিষেণদেওবাবুকে তাঁর ভীষণ ফর্সা মুখ আর সাদা-পাকা গোঁফে যেন অ্যালবিনো বাঘের মতই দেখাচ্ছিল। হেসে উঠলেন বাঘের মতই।

তারপর বললেন, কি যে বলেন ঋজুবাবু! এলেন এই প্রথমবার আমার গরীবখানায়—অথচ এত বছরের জান-পহচান, সামান্য খাতির যত্নও একটু.....

আসলে ঋজুদা আমার চেয়েও বেশী পেটুক আর ভোজনরসিক। —কিন্তু ভাবটা এমন দেখায়, যেন আলু পোস্ত আর কড়াই ডাল হলেই ত' চলে যেত, এত আর কেন ?

ভানুপ্রতাপ খুবই কম খায়। একটু পরোটা আর কালিতিতিরের কাবাব নিয়ে দু' আঙুলে নাড়াচাড়া করছিলেন উনি।

একটা ব্যাপার লক্ষ করছিলাম। উনি সব সময়ই কেমন অন্যমনস্ক। সব সময়ই ওষুধ খেলে, না হওয়াটাই আশ্চর্য অবশ্য।

তা বেনারসী প্যাঁড়া আর রাবড়ি পেলেন কোথায় ? ঋজুদা শুধোল।

বিষেণদেওবাবু হেসেই বললেন, ভানুর একজন লোক এসেছে আজই বেনারস থেকে। ঠিক বেনারস নয়, বেনারসের কাছেই, ভানুর জমিদারী থেকে।

ভানুপ্রতাপ কথাটা শুনেই চমকে উঠল হঠাৎ। এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। বলল, কে এসেছে ? মামা ? কে এসেছে ?

বিষেণদেওবাবু ভানুপ্রতাপের দিকে একঝলক চাইলেন।

তারপর বললেন, তোদের ব্রিজনন্দন এসেছে রে আজ সকালে।

ভানুপ্রতাপ মুখ তুলে বলল, ব্রিজনন্দন ? কেন ? হঠাৎ ?

এই রাবড়ি-টাবড়ি নিয়ে এল। আর তোদের জমিদারীর হিসেবনিকেশ।

ভানুপ্রতাপ মামাবাবুর মুখের দিকে চেয়ে কি বলতে গেলেন। কিন্তু কিছু বলার আগেই বিষেণদেওবাবু হাঁক পাড়লেন, কোই হ্যায় ?

জী হুজৌর।

বলে, একজন বেয়ারা বাইরে থেকে দৌড়ে এল।

বিষেণদেওবাবু বললেন, ব্রিজনন্দনকো বোলাও।

ভানুপ্রতাপ হঠাৎ উঠে পড়ে, আমাদের সকলের কাছে অনুমতি নিয়ে চলে গেলেন।

একটু পর যে-লোকটি ঘরে এসে ঢুকল তাকে দেখেই আমার ভয় লেগে গেল। আফ্রিকার সেরেঙ্গেটির নাইরোবী সর্দারকে রাতের বেলা দেখেও আমার এত ভয় লাগেনি। লোকটা লম্বা নয়, বরং বেঁটেই। কিন্তু অসুরের মত চেহারা—দেখলেই মনে হয়, নিয়মিত কুস্তী-টুস্তী লড়ে। গলায় সোনার চেনের সঙ্গে বাঁধা একটা সোনার তাবিজ। তিন-চারটে দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। মাথার সামনে চুল কম, কিন্তু কদমছাঁট। পরনে মিলের মিহি পা-দেখা-যাওয়া ধুতি আর গোলাপি রঙের টেরিলীনের পাঞ্জাবী। পাঞ্জাবীর হাতা গোটানো। বাঁ-হাতে একটা সোনার রোলেক্স ঘড়ি। আসবার সময় সে জুতো খুলে ঘরে ঢুকলো বটে—কিন্তু দরজার বাইরে রাখা তার লোহার নাল-লাগানো নাগরাখানির দিকে চেয়ে দেখলাম, জুতো জোড়াও দেখবারই মত।

বিষেণদেওবাবু বললেন, আমার বোন শুভাবাঈ ত' উত্তর প্রদেশের উজ্জানপুরের জমিদার সুরিন্দর নারায়ণ এর স্ত্রী ছিলেন। উজ্জানপুর বেনারসের কাছেই। তা ভগ্নীপতি, সুরিন্দার নারায়ণ মারা গেলেন ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে হঠাৎই। বোনটাও সেদিন চলে গেল আমার প্রায় হাতেরই মধ্যে—এই বাড়িতেই—একটু চিকিৎসার সুযোগ দিল না। দু' মাসের তফাতে দুজনে শ্মশান করে দিয়ে গেল হে। এখন আমার আঁখোকা-রোশনী এই ভানুই আছে একমাত্র। নিজে ত' বিয়েথাও করলাম না, করার সময়ও পেলাম না। পরের সম্পত্তি সামলাতে সামলাতেই জীবন গেল। সুরিন্দারের মৃত্যুর পর শুভা একটু-আধটু দেখতে শুরু করেছিল ওর জমিদারীর কাজ। ভানু ত' চিরদিনই মনমৌজী ছেলে। ওকে দিয়ে.....

ওখানে খুব ভাল আখ হয়। এ ওদের সুগার মিলের সঙ্গে বছরের পর বছর কনট্রাক্ট করা থাকে। বাঁধা লাভ। সুরিন্দার চলে যাওয়ার পর এই ব্রিজনন্দনই ওদিকটা সামলায়। যা হয়, তাতে ভানুর আর কিছুই না থাকলেও বাকি জীবন এমন গরীবের মতই কোনোক্রমে চলে যেত। কিন্তু আমার মাইকার বিজনেসের টুয়েন্টি-ফাইভ পার্সেন্ট শেয়ারও ত' ভানুরই এখন। আমি আর আমার ভগ্নীপতি সুরিন্দার দুজনে মিলেই মাইকা মাইনস্ সব নিয়েছিলাম। এই জঙ্গলের জমিদারীর আয় আর কতটুকু ? তাও ত' জমিদারী থাকলে, তবু কথা ছিল। বাকি জীবন এই ভানুরই জন্যে আমার এই খিদমদ্‌গারী করে যেতে হবে। ভানুটা একেবারেই ছেলেমানুষ। সম্পত্তি, ব্যবসা, এসব বোঝার চেষ্টাও নেই ; এলেমও নেই। সবকিছু হয়ও না। বুঝলেন ঋজুবাবু। ভানুকে বললাম, বিলেতে না গিয়ে এখানে ব্যবসা দ্যাখ। কে কার কথা শোনে ? বলল, ফীজিক্স পড়বে। ফীজিক্সের যুগ নাকি এখন। থ্যায়ের। হবে হয়ত। আমি ত' গর্তের চুহা। দুনিয়ার কোন্ খবরই বা রাখি।

তারপর রাবড়ি মাখিয়ে একটু পরোটা মুখে নিয়ে বিষেণদেওবাবু বললেন, কি জানি রে বাবা। কিসের যুগ তা জানি না—আমার এই মুলিমালোঁয়াতে ইতিহাস থেমে রয়েছে।

এখানে আমার বাপ-দাদার যুগই চলছে, চলবে।

ভানুপ্রতাপ ফিরে এসেছিলেন। দুটো বড়ি খেলেন মুখ দিয়ে তারপর মামার দিকে লজ্জা-লজ্জা মুখ করে তাকিয়ে রইলেন। কি যেন বলতেও গেলেন মামাকে, আমাদের দিকে একবার হঠাৎ তাকিয়ে।

কিন্তু কিছুই না বলে, থেমে গেলেন। মুখ নামিয়ে নিলেন।

বললেন, সত্যিই আমার এসব আসে না মামা। তুমি ত' জানোই এসব টাকা-পয়সা ব্যবসা-ট্যাবসা আমার একেবারেই আসে না। তুমিই সব নিয়ে নাও। আমাকে শুধু হাতখরচা দিও, যখন যতটুকু যা লাগে, তাতেই আমি খুশী।

বিষেণদেওবাবু ইঙ্গিতে ব্রিজনন্দনকে চলে যেতে বললেন।

তারপরই বললেন, ন্যান্সির চিঠি পেয়েছিস্ ?

ভানুপ্রতাপ বিব্রত হলেন একটু। বললেন, অনেকদিন পাইনি।

বিষেণদেও সিং গর্ব গর্ব মুখ করে বললেন, ভানুর আমার অনেকই গার্ল-ফ্রেন্ড। মেমসাহেবদের চিঠির ঠেলায় গীমারীয়ার পোস্টমাস্টার পাগল। এ হাতভাগা জায়গাতে বিলেতের টিকিট লাগানো চিঠি কি এসেছে কখনও এর আগে ? ভানুর দৌলতেই আসে। প্রথম এবং শেষ।

ঋজুদা বলল, কি রে রুদ্র ? তোর গার্ল ফ্রেন্ডদেরও চিঠি-টিঠি দিতে বলে এসেছিস না কি ?

আমি বললাম, ধ্যাৎ। কি যে বল না ? আমার কোনো গার্ল ফ্রেন্ড নেই।

খুবই খারাপ কথা। শুনে দুঃখিত হলাম। ঋজুদা বলল। অস্বাস্থ্যকর কথাও বটে বাগানে ফুল নেই, পুকুরে জল নেই, তোর মত ন্যাশানাল স্কলারশিপ পাওয়া, আফ্রিকাতে অ্যাডভেঞ্চার করা হিরোরও গার্ল ফ্রেন্ড নেই।

বলেই বলল, কি হল কি দেশের মেয়েগুলোর বলুন ত' দেখি বিষেণদেওবাবু ?

বিষেণদেওবাবু সাদা-পাকা গোঁফের ফাঁকে আবার হেসে উঠলেন।

বললেন, রুদ্দদ্দরবাবু, তাতে দুঃখের কিছুই নেই। তুমি ত' ছেলেমানুষ এখনও। এই আমারও জেনো গার্ল ফ্রেন্ড কিন্তু একজনও নেই। প্রায় চার-চারটে রুদ্দদ্দরবাবুর বয়স আমার। তবুও। হাউ স্যাড।

ওঁরা সকলেই হো হো করে হেসে উঠলেন। কিন্তু ভানুপ্রতাপ হাসলেন না।

আমিও না।

কারণ, বিষেণদেওবাবু প্রথম থেকেই আমাকে রুদ্র না বলে রুদ্দদ্দর বলে ডাকছেন।

ভানুপ্রতাপ বললেন, এক্সকিউজ মী। খেয়ে আমি আর বসতে পারি না। ঘন্টাখানেক শুতে হবে।

ঋজুদা অবাক হয়ে চলে-যাওয়া ভানুপ্রতাপের দিকে চেয়ে বলল, ব্রেকফাস্টের পরেও ? বলেন কি ?

বিষেণদেওবাবু ভানুপ্রতাপ চলে-যাওয়া অবধি অপেক্ষা করে থেকে উনি চলে যেতেই স্নেহমাখা গলায় বললেন, আজকালকার ছেলে। ছেড়ে দিন ওদের কথা।

বলেই, আমার দিকে চোখ পড়তে বললেন, রুদ্দদ্দরবাবু অবশ্য একটু অন্যরকম। ব্যাপারটা কি জানেন ঋজুবাবু ? আমার ত' আর কেউই নেই। ছেলেটার মুখের দিকে তাকালেই শুভার মুখটা মনে পড়ে যায়। বুকের মধ্যে যেন আমার কিরকম, কিরকম করে। ঐ ত' এই সমস্ত সাম্রাজ্যের মালিক। আমি ত' ওর খিদমদ্গার মাত্র।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, আমাদের পরিবারের সকলেই দারুণ মুডি। আমিই হয়ত একমাত্র ব্যতিক্রম। ওর মায়ের দিকটাই বেশী পেয়েছে ও, বাবার দিকের চেয়ে। কথায় বলে, নরাণাং মাতুলক্রমঃ। ও এই রকমই। যা খুশী করুক। আমার চোখের সামনে থাকলেই আমি খুশী। আর কিছু চাই না। অনেকদিন বজরঙ্গবলী ওকে বাঁচিয়ে রাখুন আর কিছু চাই না।

খাওয়ার ঘরের জানালা দিয়ে বাগানে এবং বাগান ছাড়িয়ে বাইরের জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন বিষেণদেওবাবু।

তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ঋজুবাবু, এ সংসারে কিছু কিছু মানুষের ঘাড় চওড়া করে পাঠান বজরঙ্গবলী। পরের বোঝা, দায়-দায়িত্ব সব তাদেরই বইতে হয়। না-বইলে, তাদের মুক্তি নেই। তাই ঝামেলা বা দায়িত্ব এড়াতে চাইলেও এড়াতে পারা সম্ভব হয় না। জানি না, ভানু বিয়ে-টিয়ে করলে আমার কি অবস্থা হবে। আজকাল মায়ের পেটের ছোট ছোট ভাইয়েরা পর্যন্ত বেইমানী করে, বেইজ্জত করে মানুষকে, আর এ ত' বোনেরই ছেলে। সবই বজরঙ্গবলীর ইচ্ছা।

বলেই, মহলের হাতার মধ্যে একটা খুব উঁচু ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ডের মাথায় এলোমেলো দামাল হাওয়ায় পত্পত্ করে উড়তে-থাকা বীর হনুমানজীর নক্সা-তোলা একটা গাঢ় লাল নিশানের দিকে তাকালেন।

ওঁর চোখ অনুসরণ করে আমিও নিশানটার দিকে তাকিয়েছিলাম। একেই এ অঞ্চলে সকলে হনুমান-ঝাণ্ডা বলে। ঋজুদা বলছিল, এত বড় রাজপ্রাসাদের কম্পাউন্ডে এমন ঝাণ্ডা বড় একটা দেখেনি নাকি। এগুলো বিহারের প্রত্যেক বস্তীতেই দেখতে পাওয়া যায়।

মনে মনে নিশানটার দিকে তাকিয়ে বললাম, জয় বজরঙ্গবলীকা জয়। অ্যালবিনো যেন আমার হয়। আমার নতুন ক্লাসে প্রতিভু বলে একটি নতুন ছেলে এসেছে, সে হায়ার সেকেন্ডারীতে টেন্থ্ হয়েছিল। আমার পজিশান এসেছে টুয়েন্টিফার্স্ট। খুব ডাঁট ছেলেটার। অ্যালবিনোটা মেরে ফেলি। তারপর কোলকাতা ফিরে ওকে বোঝাব যে ভালো ছেলে হতে হলে অলরাউন্ডার হতে হয়। সবদিকে যে ভাল, যার অনেক কিছুতে ইন্টারেস্ট আছে, সেইই আসলে ভাল। বইয়ের পোকা হয়ে শুধু পরীক্ষাতে ভালো ফল করা মানেই ভালো নয়।

তার পরমুহূর্তেই মনে হল। থাক্গে। প্রতিভুকে ক্ষমাই করে দিই। বেচারা। ও কি করে জানবে, জঙ্গলের জগতের কথা, এই সব বন্দুক, রাইফেলের পিস্তল-রিভলবারের অ্যাডভেঞ্চারের এত সব কথা ; অ্যালবিনো বাঘের কথা। ওর জগৎ ত' ছোট্ট জগৎ। ক্ষমাই করে দিলাম, তাই-ই ওকে। ও কি পায়নি, পেলো না, ও তা জানেই না।

ভাগ্যিস আমার ঋজুদা ছিল।

ঋজুদা বলল, এবার রুদ্রবাবু ? কি প্রোগ্রাম ?

আমি বললাম, আমি এত রাবড়ি খেয়েছি যে আমার ঘুম পাচ্ছে।

ঋজুদা বলল, মার খাবি। চল্ হাঁটতে যাবি আমার সঙ্গে।

এই রোদে ? বলেন কি ? বিষেণদেওবাবু রুপোর দাঁত-খোঁচানী দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে বললেন।

ঋজুদা বলল, জঙ্গলে বেড়ানোর কোনো সময় অসময় নেই। জঙ্গল, বছরের বা দিনের সবসময়ই ভাল।

বিষেণদেওবাবু বললেন, যেখানেই যান, মালোয়াঁমহলে পিছনের জঙ্গলে যাবেন না। ঐদিকে একটা পোড়োবাড়ি মত আছে। বহু বছর ওদিকে আমরা কেউই পা দিইনি। আগে আমার ঠাকুর্দার নাচঘর ছিল। আয়না-ফায়না করে ভেঙে গেছে। ইঁটও হয়ত খসে পড়েছে। এখন সাপেদের আড্ডা। বহুত খতরনাগ জায়গা। ওদিকে না যাওয়াই ভাল।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, কি রুদ্রদ্রবাবু, শঙ্খচূড় সাপ জানেন ত'? এক মাইল অবধি দৌড়ে গিয়ে মাথায় ছোবল মারে।

আমি বিষেণদেওবাবুর দিকে ঠাণ্ডা ক্ষমার চোখে তাকিয়ে রইলাম। মুখে কিছুই বললাম না। আফ্রিকার গাবুন্‌-ভাইপার এর হাত থেকে বেঁচে ফিরে এলাম, শেষে কী-না দিশী সাপ আমার মত স্বদেশ-প্রেমিককে কামড়াবে?

ঋজুদা বলল, চল্‌ রুদ্র ঘুরে আসি।

বিষেণদেওবাবু বললেন, দুপুরের খানা ঠিক একটাতে। তার আগে ঘুরেফিরে চলে আসবেন। অবশ্য, আপনারা না এলে বসব না আমরা কেউই।

ঋজুদা হাসলো। বলল, নাস্তাই হজম হোক আগে। লাঞ্চের সময় কিন্তু বেশী কিছু করবেন না।

বিষেণদেওবাবু, রুপোর খোঁচানী দিয়ে এবার কান খোঁচাতে খোঁচাতে বললেন, না না, খুবই সিম্পল মেনু আজ দুপুরে। শুধু খানীরই প্রিপারেশান।

ঋজুদা যেতে গিয়েও, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, কি রকম?

—এই চৌরী, পায়া, লাব্বা, চাঁব, বটি-কাবাব, শুলহার কাবাব। সঙ্গে তক্কর আর বিরিয়ানী। কাশ্মীরের পহালগাঁও থেকে জাফ্‌রান্‌ আনানো আছে, শ্রীলঙ্কা থেকে গোলমরিচ আর পাটনা থেকে লাজোয়াব বাবুর্চী।

ঋজুদা বলল, শুনে জিভে জল আসছে আমার। কিন্তু এতগুলো পদের মধ্যে মধ্যে কিছু হজমী টজ্‌মী রাখেননি? নইলে খানী যে পেটে গিয়ে লাথি ছুঁড়বে।

জী হাঁ। তাও রেখেছি। বললেন, বিষেণদেওবাবু। নিম্বু পানি আর হামদর্দ দাওয়া কোম্পানীর পাচনল ট্যাবলেট। ঐসব চলবে, আফটার ইচ্‌ কোর্স।

তারপর বললেন, আপলোগ ইত্‌মিনান্‌সে ঘুম-ঘামকে আইয়ে—। খানা এ্যাইসা বন্‌ রহা হ্যায় কি মেরী মেহেমানৌকো মজা আ জায়গা।

ঋজুদা বলল, আপনার মত রহিস্‌ আদমী মেলা ভার।

বিষেণদেওবাবু হাত জোড় করে বললেন, আমি কেউ নই। সবই বজরঙ্গবলীর দয়া। তিনিই সব। আমি তাঁর খিদ্‌মদ্‌গার মাত্র।

॥ ৪ ॥

ঋজুদা পথে বেরিয়েই গম্ভীর, অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

একটা লাঠি নিয়েছে হাতে। সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটছে—তবে সেই খুঁড়িয়ে চলাটাই হচ্ছে স্বাভাবিক।

ওলড় রাত্‌রা রোডের দিকে কিছুটা গিয়েই ঋজুদা রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল ডানদিকে। সেখানে কোনো শুঁড়ি পথ-টথও ছিলো না। আমি ভাবলাম, নিশ্চয়ই কোনো দুষ্প্রাপ্য পাখি বা প্রজাপতি দেখেছে। কিন্তু কালিতিতির ছাড়া অন্য কোনো পাখিই ডাকছে না। এ অঞ্চলে তিতির, কালিতিতির, আসক্‌ল, বটের বুনোমুরগী, ময়ূর ইত্যাদি একেবারে ভর্তি। যেন্দার-শুটিং-এর এমন স্বর্গ বড় একটা দেখা যায় না। ঋজুদাই বলছিল। শিকার

বন্ধ হয়ে যাওয়াতে গেমস্‌ আগের থেকে বেড়েওছে অনেক।

রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের গভীরে এসে একটা ছোট্ট টিলামত দেখে ঋজুদা তার ছায়ায় বসল, লাঠিটা পাশে রেখে। তারপর যত্ন করে পাইপ ভরতে লাগল।

কি যেন ভাবছিল ঋজুদা।

পাইপটা ভরা হয়ে গেলে, ভাল করে পাইপটা ধরিয়ে কোলকাতার স্টেটবাসের একজস্ট পাইপ থেকে যেমন ধুঁয়ো বেরোয় তেমন ধুঁয়ো ছাড়ল। ধুঁয়োতে জায়গাটা ঢেকে গেল। তবে, পাইপের ধুঁয়োর গন্ধ ভাল এবং রঙ নীলচে-সাদা। আমাদের পায়ের কাছেই, মাটিতে কতগুলো পোকা গর্ত থেকে ঢুকছিলো বেরোচ্ছিল। ঋজুদার পাশে বসে আমি তাদের দেখছিলাম। পোকাগুলো ভারী সুন্দর দেখতে। সামনেটা লাল; পেছনটা কালো। কুঁচ ফলের মত।

ঋজুদা নিজের মনেই বলল, ঢেঁকিকে স্বর্গে গিয়ে ধান ভানতে হয় বুঝলি।

কি রকম? ঋজুদার কথাতে রহস্যের গন্ধ পেলাম আমি।

ঋজুদা বলল, রুদ্রদ্রবাবু, এখানকার রাবড়ি এখানেই হজম করে যেতে হবে। চেঞ্জে এলাম বটে, কিন্তু শরীর ভাল হবে বলে মনে হচ্ছে না।

আমি আবার উৎসুক হয়ে বললাম, কেন একথা বলছ?

ঋজুদা বলল, মনে হচ্ছে না, ব্যস্‌...তার আবার কেন কিসের?

কিছুক্ষণ পাইপ খেয়ে বলল, তোর ঘরটাতে যে জানালাগুলো আছে তা দিয়ে মালোয়াঁ-মহলের পিছন দিকটা দেখা যায় না রে?

—হ্যাঁ।

—আমরা যদি এখন পশ্চিমে যাই, তাহলে ত' বাড়ির পিছনে যাওয়া হবে? কি?

ঋজুদা বলল।

তারপরই বলল, কম্পাস্‌ এনেছিস?

আমি বললাম বাঃ রে! তুমি বললে এখানে শুধুই খাবে, ঘুমোবে আর কোলকাতার মাখন-বাবু চেম্বারসের মত ক্যাম্বিসের জুতো পায়ে বেড়াবে। আর এখন...

ঠিক আছে। ঋজুদা বলল, কথা বলবি না। চুপচাপ চল। এ জঙ্গলেই হয়ত অ্যাল্‌বিনো বাঘটা আছে। বিরাট বাঘ। বাঘ ত' আর চীফ মিনিস্টারের গাড়ির মত লাল-বাতি জ্বেলে পী-পাঁ-পাঁ-পী করে জানান্‌ দিয়ে আসবে না। কোয়াইটলী এসে, ফাস্ট্‌লী, বাট নীটলী কিছু করেই চলে যাবে।

কিছুদূর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চরাই-উৎরাই, আলো-ছায়ার মধ্যে দিয়ে গিয়ে আমরা দূরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে স্কোয়াশ-খেলার কোর্টের মত উঁচু একটা পোড়ো-বাড়ি দেখতে পেলাম। বাড়িটা পাথরের, একদিকটা ধসে গেছে। অশ্বত্থ গাছ গজিয়ে উঠেছে এখানে ওখানে। বাড়িটার চারপাশে জংলী নিমের ঘন জঙ্গল। কিছু এলোমেলো ইউক্যালিপ্‌টাস্‌।

ঋজুদা বলল, রুদ্র। এবারে মালোয়াঁমহল দেখতে পাচ্ছিস? পিছন ফিরে?

—হুঁ। আমি বললাম।

—তোর ঘরের জানালা বা পেছনদিকের অন্য কোনো ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে দেখলে এই নাচ ঘর দেখা যাবে?

—যাবে! তোমার ঘর থেকে নয়, আমার ঘর থেকে।

দেখা যাবে ত' সকালে উঠে তোর চোখে পড়েনি কেন?

বোধহয় নিমগাছগুলোর জন্যে। তাছাড়া, বাড়িভর্তি যত জানোয়ারের যত রকম ট্রোকি—তাই দেখার সময় হল না, বাড়ির বাইরে তাকাবার সময় কোথায় ?

জঙ্গলের ভিতরে সরে আয় এবারে। ফাঁকা জায়গাতে থাকিস না। ঋজুদা বলল।

কেন।

আমাদের কেউ লক্ষ করতে পারে হয়ত।

এ কিরকম জায়গায় বেড়াতে এলে ?

আমি বললাম, ভাল হচ্ছে না কিন্তু ঋজুদা। বলতেই দেখতে পেলাম, একজন মেয়ে আর একজন পুরুষমানুষ পাকদণ্ডী দিয়ে আসছে আমাদের দিকেই।

ঋজুদাকে ইশারাতে দেখাতেই, ঋজুদা ফিস্‌ফিস্ করে বলল, রুদ্র সামনের ঝনটায় লুকিয়ে পড়।

বলতে না বলতেই, আমরা দুজন তাড়াতাড়ি ঝনটাতে নেমে বালির মধ্যে পা ছড়িয়ে বসে পড়লাম, পাথরে পিঠ রেখে।

পুরুষ আর মেয়েটি কথা বলতে বলতে এদিকে আসছিল। কিন্তু তখনও বেশ দূরে ছিল।

হঠাৎ ঋজুদা বলল, গলা ছেড়ে একটা গান ধরত রুদ্র।

গান ? আমি চমকে উঠলাম।

হ্যাঁ, গান।

ধমকে বললে, কেউ গাইতে পারে না। তবুও ফিসফিস করে বললাম, রবীন্দ্রসঙ্গীত ?

না। হিন্দী সিনেমার গান। এরা কি শান্তিনিকেতনে পড়েছে যে, রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে দৌড়ে আসবে ?

তারপর বলল, হিন্দী গান। সিনেমার গান।

আমি আশ্চর্য হয়ে ঋজুদার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

গান না-শুরু করায় ঋজুদা আমার মুখের উপর নীরব বিরক্তির নায়েগ্রা ফল্‌স ঢেলে দিয়েই হঠাৎ ভূমিকম্পর মত, গলা ছেড়ে গান ধরল :

রে মাম্মা, রে মাম্মা রের-এ-এ-এ-এ-
রে মাম্মা, রে মাম্মা রের-এ-এ-এ-এ,
হাম্ ত' গ্যায়ে বাজার সে লানেকা লাট্টু
লাট্টু কাট্টু কুছ্ না মিলে, পিছে পড়ে টাট্টু।
রে মাম্মা রে মাম্মা রের-এ-এ-এ-এ...
রে মাম্মা রে মাম্মা রের-এ-এ-এ-এ...।

ঋজুদা মুখ হাঁ-করে গান গাইছিল, আমিও হাঁ-করে ঋজুদার দিকে চেয়ে ছিলাম। ঋজুদা কিন্তু চেয়ে ছিল ঝর্নার অন্য পারে। যেদিকে যে-কোনো মুহূর্তে ঋজুদার গানে মুগ্ধ-হওয়া কোনো মানুষের মুখ দেখতে পাবে বলে আশা করছিল বোধহয় নিজে।

হঠাৎ গান থামিয়ে ফিসফিস করে বলল, যখন লোকদুটো আসবে, ওদের সঙ্গে আমি কথা বলব। তুই ততক্ষণে উঠে ওদের কাছে গিয়ে, যেন এমনিই উঠে চলে যাচ্ছিস, এমন ভাবে ওদের ভাল করে দেখবি কাছ থেকে ভাল করে। ডিটেইলস্-এ দেখবি।

এইটুকু বলেই, ঋজুদা আবার গান ধরল, রে মাম্মা রে মাম্মা.....।

অসহ্য। আমার পেটের রাবড়ি এমন গান শুনে এমনিতেই হজম হয়ে গেলো।

গান গেয়ে গেয়ে ঋজুদার গলা এবং তা শুনে আমার মাথা ধরে গেল কিন্তু কোনো

লোকই ঋজুদার সংগীত প্রতিভাতে মুগ্ধ হয়ে এদিকে এলো না।

মিনিট দশেক পর ঋজুদা আবার পাইপ ধরালো। পাইপ ধরিয়েই বলল, পাইপের আমকোরা তামাকের গন্ধই সব মাটি করে দিল, বুঝলি। বলে, একমুঠো বালি নিয়ে কিছুটা উপরে ছেড়ে দিয়ে দেখলো হাওয়া কোন্‌দিকে। তারপর বালি কোনদিকে উড়ছে দেখে নিয়ে বলল, দেখলি। লুকিয়ে পড়া না-পড়াতে কোনোই তফাৎ হলো না। পাইপের গন্ধ, ওরা আগেই পেয়েছিল। তাই গান গেয়ে আমাদের ইনোসেন্স প্রমাণ করবার দরকার ছিলো না।

ঋজুদার এই যুক্তি আমার মাথায় ঢুকলো না। তাদের সঙ্গে কথাই যদি বলতে চায় তাহলে লুকিয়ে বা পড়লো কেন ? আর লুকোলই যদি তাহলে গানই বা গাইতে গেল কেন ? আর গান বলে গান ? গানের বাবা।

বললাম, লোকগুলো কারা ? ঋজুদা বলল, সেই ত' হচ্ছে কথা।

বললাম, তাহলে চলো আমরা তাড়াতাড়ি মালোয়ামহলে ফিরে যাই। বিষেণদেওবাবু আর ভানুপ্রতাপকে বলি যে, ওঁদের খুব বিপদ। নাচঘরে সাপ নেই, এক জোড়া মানুষ আছে।

ঋজুদা হেসে ফেলল। বলল, তুই এতদিন আমার জঙ্গলের চামচে ছিলি। এটা কিন্তু জঙ্গলের ব্যাপারই নয়। গোয়েন্দাগিরিতে তুইও যেমন কাঁচা, আমিও। শরীর ঠিক করতে এসে আমাদের এর মধ্যে জড়ানো কি ঠিক হবে নিজেদের ? না, কালকের দিনটা দেখেই কোলকাতা ফিরে যাব ? বল রুদ্র। হাজারীবাগে, গোপালের বাড়িতেও গিয়ে থাকতে পারি। চমৎকার ছবির মত বাড়ি—বর্‌হি রোডে—। এই অঞ্চলে থাকার জায়গার অভাব আমার নেই। বল্ কি করব ?

আমি বললাম, সবই বজরঙ্গবলীর ইচ্ছা। আমি আর কি বলব ?

ঋজুদা বলল, তোর কাছে খুচরো আছে ?

বললাম, পঞ্চাশ নয়া আছে একটা।

টস্ কর।

আমি অনেক উঁচুতে টস্ করে দিলাম কয়েনটাকে। ঋজুদা বলল, হেড হলে চলে যাব, টেল্ হলে থাকব। বলতে-বলতেই, পঞ্চাশ নয়াটা বালিতে পড়ল, নরম একটা থপাস্ শব্দ করে।

আমরা ঝুঁকে পড়ে দেখলাম, টেল।

আমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ঋজুদাকে চিন্তিত দেখাল।

আমি আবার বললাম, সবই বজরঙ্গবলীর ইচ্ছা।

ঋজুদা আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল কথা না বলে।

আমরা যখন মালোয়ামহলে পৌঁছলাম, তখন ভানুপ্রতাপের সঙ্গে বসবার ঘরেই দেখা হল। আমাকে বললেন, কোথায় গেছিলে ? আমরা গাড়ি করেই না-হয় যেতাম কোথাও।

আমি বললাম, আমরা ত' এখানে খেতে, হাঁটতে আর ঘুমোতেই এসেছি।

ভানুপ্রতাপ বললেন, কোনদিকে গেছিলে তোমরা ? কতদূর ?

আমি উত্তর দেবার আগেই ঋজুদা হালকা গলায় বলল, কাছাকাছি গিয়ে একটা সুন্দর ছায়া-ঘেরা নালা দেখে আমরা বালিতে লম্বা হয়ে শুয়ে গলা সাধছিলাম। আধ-শোয়া অবস্থায় ছায়ায় বসে, জমিয়ে পাইপও খেলাম আমি। বড় সুন্দর পরিবেশ তোমাদের

মুলিমালোয়াঁ।

কথার উত্তর না দিয়ে ভানুপ্রতাপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঋজুদার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, আপনারা কি মহলের পিছনে নাচঘরের দিকে গেছিলেন ? ওদিকে যাবেন না কখনও।

আমি বললাম, কেন বলুন ত' ?

ভানুপ্রতাপ রুক্ষ গলায় বললেন, মানা করছি, যাবেন না। মেহমানরা কথা না শুনলে ত' মুশকিল।

বলেই ডাকলেন, ছোট্টু।

ছোট্টু এসে হাজির হল যেন মাটি ফুঁড়ে।

ভানুপ্রতাপ বললেন, তুমি এখন থেকে সব সময় এঁদের সঙ্গে থাকবে। এ জায়গা ওঁদের চেনা নয়। বিপদ-আপদ হতে পারে। কখনও তুমি ওঁদের একা ছাড়বে না।

ভানুপ্রতাপের স্বভাবটা বড় রুক্ষ। মামার ঠিক উল্টো। ঋজুদা ওর কথার ধরনে রেগে উঠল। মুখটা থমথম করতে লাগল। আমিই রেগে গেলাম, আর ঋজুদা ! আফ্রিকার ওয়াণ্ডারাবোদের দেশ থেকে ঘুরে এলাম, আর মুলিমালোয়াঁতে আমাকে ভয় দেখাচ্ছে এ। আমি কি দুধের শিশু ?

ঋজুদা কথা ঘুরিয়ে ভানুপ্রতাপকে শুধোল, মামাবাবু কোথায় ?

বেরিয়েছেন। খানার সময়ে ঠিক ফিরে আসবেন। আপনারা কিছু খাবেন ?

নিম্বুপানি, জিরাপানি বা লস্সি-টস্সি ? আমপোড়া শরবত খাবেন ?

ঋজুদা বলল, আমি কিছু খাবো না, রুদ্রকে কিছু খাওয়াও। আমি একটু ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করছি।

ঠিক আছে। বলেই, ভানুপ্রতাপ দু' হাতে তালি বাজালেন।

একজন বেয়ারা দৌড়ে এল। ভানুপ্রতাপ বললেন, লস্সি ! সাব্‌কা লিয়ে।

বেয়ারা চলে যেতেই টানাপাখার নীচে বসে ভানুপ্রতাপ বললেন, জেনারেটরের অর্ডার দিয়েছিলাম আমি। তাহলে আলো পাখা এয়ার কন্ডিশানার ফ্রিজ সবই রাখা যেত এখানে, মামা আমার বড় কৃপণ। বলল, টানাপাখা বিনি পয়সায় টানে প্রজারা। জেনারেটরের পয়সা বরবাদী হবে। তাছাড়া তুই আর কতদিন থাকিস এখানে।

তারপর বললেন, জেনারেটরে অবশ্য ভটর্ ভটর্ আওয়াজও হয়। বিহারে ভিজেলেরও ক্রাইসীস্।

যাকগে, মামা যা ভাল বোঝেন করবেন।

যারা পাখা টানে, তারা মায়না পায় না ? আমি শুধোলাম।

মায়না দিলে ত' পাবে। খেতে পায় শুধু। অড়হড়ের ডাল আর রোটি। প্রজারা এখনও হল ব্লেভ্-এর মত। মামার এখনও তাই ধারণা। আমি লুকিয়ে চুরিয়ে যা পারি দিই। প্রত্যেক ঘরের জন্যে চারজন লোক। বারো ঘণ্টা করে ডিউটি। আমরা ঘুমুবো, ওরা পাখা টানবে বাইরে গরমে বসে। ইন্‌হিউম্যান। অথচ মামা যা কিছু করেন আমারই জন্যে। আমারই জন্যে সব সঞ্চয়।

আমি বললাম, আপনার মায়ের কি অসুখ হয়েছিল ?

জানি না। ডাক্তার ডাকার সময় পেলেন কোথায় মামা ? হার্টফেল্। আমি ভোরবেলা যখন ঘুম থেকে উঠলাম, তখন মা একটা ফোটো হয়ে গেছেন। কি সব জরুরী কাগজপত্র সই-সাবুদ করতে উজ্জয়নপুর থেকে মামার জরুরী চিঠি পেয়ে এখানে আসতে হল মাকে।

আপনার বাবার কোনো ভাই-টাই নেই ?

কেউই নেই। বাবা, ঠাকুর্দার একমাত্র ছেলে ছিলেন। আমিও বাবার একমাত্র ছেলে। মামা আর মা ছিলেন দাদুর দুই সন্তান। এখন শুধু মামা।

বাবা মারা গেলেন কোথায় ?

—এই মুলিমালোয়াঁতেই। কাল আমরা যে রাস্তায় গাড়ি নিয়ে গীমারিয়া গেলাম—ঐ রাস্তাতেই ঘোড়ায় চড়ে যাবার সময় ঘোড়া থেকে হঠাৎ পড়ে মারা যান বাবা। বাবার খুব ঘোড়ার শখ ছিল। কোলকাতার টার্ফ ক্লাবের মেম্বার ছিলেন। ব্যাঙ্গালোরেরও। রেসিং সীজনে কোলকাতা আর ব্যাঙ্গালোরেই থাকতেন।

এমন সময়ে দরজার আড়ালে যেন কার ছায়া সরে গেল। আমার সন্দেহ হওয়াতে গলায় ইচ্ছে করে কাশি তুলে আসছি বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম তাড়াতাড়ি। দরজার কাছে পৌঁছতেই দেখি, ছোট্টু, ভানুপ্রতাপের খাস বেয়ারা আমাকে দেখেই সরে গেল। আমার কিন্তু মনে হয়েছিল, ব্রিজনন্দনকেই দেখতে পাবো। লোকটাকে আমার একেবারেই পছন্দ হয়নি। প্রথম দর্শনেই।

ফিরে এসে বললাম, ঐ ব্রিজনন্দন লোকটা কে ? আপনাদের বাবার জমিদারীর পুরনো লোক ?

ভানুপ্রতাপ বললেন, আরে না না। সেখানেও ত' সব চোরের আড্ডা। মামাবাবুর জানা, বিশ্বস্ত লোক। মাইকা মাইনের সর্দার ছিল। ওর বাড়ী মীর্জাপুরে—উত্তরপ্রদেশের মীর্জাপুরে। ব্রিজনন্দনকে বাবার মৃত্যুর পর থেকেই মামা উজ্জয়নপুরে পাঠিয়েছিলেন। লোকটা খুব কাজের লোক। ঐ ত' সব দেখাশুনো করে আমাদের জমিদারীর।

তারপর পকেট থেকে ট্যাবলেট বের করে আরেক ঢোঁকের সঙ্গে একটা ট্যাবলেট খেল। খেয়ে বলল, তবে.....

আমি বললাম, তবে কি ?

ভানুপ্রতাপ এদিক ওদিক চেয়ে বললেন, ঐ ব্রিজনন্দন লোকটা খুব অপয়া।

কেন ? আমি উৎসুক হয়ে শুধোলাম।

অপয়া এইজন্যে বলছি যে, ও এখানে এলেই কোনো দুর্ঘটনা ঘটে। বাবার এবং মায়ের মৃত্যুরও একদিন আগে, ও এখানে এসে হাজির হয়েছিল। আরেকবার এসেছিল, মা বেঁচে থাকতে। সেবার ও আসার পরের দিন মামাবাবুর এমন অসুখ হল—ম্যালিগ্‌ন্যান্ট ম্যালেরীয়া—যে মামাবাবুকে বাঁচিয়ে তোলাই মুশকিল ছিল। কানেও প্রায় কালা হয়ে গেছিলেন। সেইজন্যেই বলি যে, লোকটা মান হুস্।

মান হুস্ মানে কি ? আমি বোকার মত জিজ্ঞেস করলাম।

সরী। বললেন ভানুপ্রতাপ। আই মীন আন্‌লাকি। যেমন শিকারে বেরিয়ে পথে যদি প্রথমেই লুমরী দেখে এখানের শিকারীরা, তাহলে ধরেই নেন যে, সেদিন অযাত্রা।

লুমরী কি ?

সরী ! লুমরী মানে খ্যাঁকশিয়াল ; ফক্স্।

ওঃ ! আমি বললাম।

ভানুপ্রতাপ বললেন, তোমরা মেহমান। কালকে অ্যালবিনো বাঘটা তোমারই মারো, এই মামার ইচ্ছা ; আমারও ইচ্ছা। হাজারীবাগের শিকারীরা খবর পেলে ভীড় লাগিয়ে দেবে। তবে এই এলাকাতে কায়দা করা শক্ত। রাতে জীপ নিয়ে এসে স্পট লাইটে মেরে নিয়ে যান ত' অন্য কথা। দিনের বেলা এই এলাকাতে যেই-ই ঢুকুন না কেন, কারোই

সাহস হবে না একটাও গুলি ছুঁড়তে। আমাদের লোকেরা তাহলে গুলিতে তাঁদের ভেজে দেবে।

হাজারীবাগে বুঝি ভাল ভাল শিকারী আছেন? আমি শুধোলাম।

বাঃ নেই। বিজয় সেন ছিলেন সবচেয়ে নামকরা। তারপরের আমলে টুটু ইমাম্। টুটিলাওয়ার জমিদার ইজাহারুল হক্। গোপাল সেন, বদিবাবু টুটু—ইমামের ছেলে বুলু ইমাম। শিকারীর অভাব কি? অ্যাল্‌বিনোটা তোমরা চুপচাপ মেরে নিয়ে চলে যাও ত'। সব শিকারীরাই হচ্ছে মেয়েদের মতন জেলাস্। শিকারী হিসেবে আমি-তুমিও তাই, স্বীকার করি আর নাই করি। অবশ্য তোমাদের দিয়ে মারাবেন বলেই হয়ত মামা আর কাউকে জানাননি। আমার সম্বন্ধে অবশ্য মামাবাবুর কোনো জেলাসী নেই। আমার কারণে আমার ভালোর জন্যে, মামাবাবু নিজের খুনও দিতে পারেন। কিন্তু মামাবাবুর অনেক শত্রু হয়ে গেছে। ওঁর জন্যে বড়ই চিন্তা হয় আজকাল। বন-জঙ্গলের জায়গা। কখন কে যে মেরে দেয় ওঁকে, তার ঠিক কি? বলি, সব সময় বডিগার্ড নিয়ে যাওয়া-আসা করতে, তা কখনও কি শোনেন কথা? বলেন, আমার বজরঙ্গবলী আছেন।

বোধহয় আমাদের দেরী দেখেই ঋজুদা উপর থেকে নেমে এল। পায়জামা-পাঞ্জাবী পরে। এই পোশাকেই খাওয়া-দাওয়া সেরে আজ দিবানিদ্রা দেবে বলে মনে হল।

ঋজুদা নামতে-না-নামতেই বাইরের পোর্টিকোতেও গাড়ি ঢোকার আওয়াজ হলো। একটা কালো রঙের ব্যুইক্। ডিজেল এঞ্জিন বসিয়ে নেওয়া হয়েছে। ধক্ ধক্ ধক্ আওয়াজ করছিল ডিজেলের এঞ্জিন।

হাসতে হাসতে ঢুকলেন বিষেণদেওবাবু। বললেন, কি? বেড়ানো হল? রুরুদ্দরবাবু?

আমি মাথা নোওয়ালাম। টস্-এ যখন টেলই উঠেছে তখন আমা-হেন বোকার কথাবার্তা কম বলাই ভালো।

ঋজুদা বললেন, গেছিলেন কোথায়?

এই একটু হাজারীবাগে।

হাজারীবাগ? কেন?

আরে কালকে ত' অ্যাল্‌বিনো টাইগার মারা পড়বে। এদিকে কাউকে না পারছি বলতে, না-পারছি চাপতে। তাইই সকলকে এমনিই নেমন্তন্ন করে এলাম শনিবার রাতে খাওয়ার জন্যে।

সকলকে মানে?

বদিবাবুকে, গোপালবাবুকে, পদ্মার রাজা, গোন্দার রাজা, হাজারীবাগের ডি. সি. এস-পি কনসার্ভেটর সাহেব, ডি. এফ-ও সাহেব, সক্কলকে। আপনার নাম করে। সকলেই আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান। সেউ উপলক্ষে আসবেন। খেয়েও যাবেন।

বদিবাবুকে চেনেন ত'? সেই যে কাতরাসের কলিয়ারীর মালিক। হটখোরি পিতিজ-এ জঙ্গলে ত' ওঁর রীতিমত বাড়িঘরই ছিল এক সময়। ও জঙ্গলেও একটা অ্যাল্‌বিনো জুটেছিল একবার, বহু বছর আগে। সেই বাঘ মারার জন্যে জবরদস্ত শৌখীন বদিবাবু কমপক্ষে তখনকার বাজারেও কিছু-না-কিছু এক লাখ টাকা খরচ করেছিলেন। হাঁ আপনারা বাঙালীরা, পয়সা হলে, খরচা ভি করেন বোটে। দিল্ আছে বোটে।

ভানুপ্রতাপ টিপ্পনী কাটলেন। বললেন, মামা তাহলে আমি ত' বাঙালীই হচ্ছি। ওর কথাতে সকলেই হেসে ফেললাম আমরা।

ঋজুদা পাইপটা ধরিয়ে অনেকখানি ধুঁয়ো ছাড়ল। তারপর বলল, শনিবার রাতে খেতে বললেন সকলকে। বাঘ কি আর পোষা জানোয়ার যে মারা পড়বেই? তাছাড়া.....

বাঘের সঙ্গে কি সম্পর্ক। অ্যাল্‌বিনো ত' একটা অ্যালিবাই। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্যেই ডাকলাম সকলকে। আলাপ করতে আসবেন এত মাইল জঙ্গলের রাস্তায়, ত' খেয়েও যাবেন। এই আর কি? আপনার মত নামী লোক আমার মেহেমান হয়েছেন আর আপনার সঙ্গে সকলকে মিলিয়ে দেবো না?

বলেই, বললেন, আপনার তামাকের গন্ধটা বেশ ভাল ত? কি তামাক এটা?

এ্যামফোরা।

দিশী।

ঋজুদা বললে, আমি দিশী জিনিসই পছন্দ করি, তবে এটা আমাকে দিয়েছে একজন। এটা ডাচ্ তামাক।

ঋজুদা কথা ঘুরিয়ে বলল, কাল ছুলোয়া আরম্ভ করবেন কখন?

একেবারে ভোরে। আমরা বেরোব বাড়ি থেকে পাঁচটাতে। তিনশ বীটার ছুলোয়া করবে। ভানুরই সব বন্দোবস্ত। আমাদের চারটে মাচা—স্টপারদের মাচা আজ সবই বাঁধা হয়ে গেছে। আপনারা কি পা মুড়ে বসবেন মাচাতে? না ফোল্ডিং-চেয়ার নেবো? মাচার উপরে ডানলোপিলো পাতা থাকবে যদিও।

ঋজুদা বলল, অ্যাল্‌বিনো বাঘটা বেরোলেই হল, তাকে আপনি কাঁটার উপরেই বসতে দিন আর উল্টো করে চৌপাই বেঁধে তার উপরেই বসান। তাতে কিছুই এসে যায় না।

একজন বেয়ারা এসে জিজ্ঞেস করল, খাবার লাগাবে কী না।

বিষেণদেওবাবু ঋজুদার দিকে তাকালেন।

ঋজুদা দেওয়ালের বিরাট সুইস্ কুক্কু-ক্লকের দিকে চেয়ে বলল, পৌনে দুটো। হ্যাঁ। খাওয়া যেতে পারে।

বিষেণদেওবাবু বললেন, পাঁচ মিনিটে জামা-কাপড় ছেড়ে আসছি আমি। তারপর বেয়ারাদের ইশারাতে বলে দিলেন খানা লাগাতে।

ঋজুদা ভানুপ্রতাপের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

ভানুপ্রতাপ অস্বস্তিভরা কণ্ঠে বলল, আমায় কিছু বলবেন?

না। ঋজুদা অন্যমনস্ক গলায় বলল।

ও-ও-ও...। বলল ভানুপ্রতাপ।

বিষেণদেওবাবু জামা-কাপড় ছেড়ে এসে বললেন, চলো রুরুদ্দরবাবু। খাসীর প্রতি একটু সম্মান দেখানো যাক।

কি বলব, ভেবে না পেয়ে বোকার মত বলে ফেললাম, চলুন।

ঋজুদা বলল, বলিস কি রে রুদ্র? কাক ত' কাকের মাংস খায় না বলেই জানতাম এতদিন।

হো হো করে সকলে হেসে উঠল। আমার দু' কান গরম হয়ে লাল হয়ে উঠল।

ঋজুদাটা বড় অকৃতজ্ঞ। প্রাণে বাঁচিয়ে ফিরিয়ে আনলাম কিলালার হাত থেকে। আর এই কী-না কৃতজ্ঞতাবোধ!

একেবারে যা-তা।

বিষেণদেওবাবু বললেন, এখন আর কী রহিমী, আর কী খাওয়া-দাওয়া! উও জমানা চলা গয়ে, যব খলীল খাঁ ফাক্তা উড়হাতে থে!

॥ ৫ ॥

খাওয়া-দাওয়ার পর ঋজুদা আমার ঘরে এল।

আমি বললাম, ঐ কথাটার মানে কি ঋজুদা ?

কোন্ কথাটা ?

ঐ যে, উও জমানা চলা গ্যয়ে, যব খলীল খাঁ ফাকতা উড়হাতে থে !

ঋজুদা হেসে উঠল।

বলল, বুঝলি না। এর মানে হচ্ছে, খলীল খাঁয়েরা যখন পায়রা ওড়াতেন তখনকার দিন আজ আর নেই।

খলীল খাঁ কে ?

আরে মুশকিল ! এ ত' একটা চলতি কথা। বিহারে এরা বলে, কাহাবৎ।

আমরা যেমন বলি : লাগে টাকা, দেবে গৌরী সেন। খলীল খাঁও ঐ রকমই, গৌরী সেনের মত। আসলে আগেকার দিনে ত' অনেকেরই বড়লোকী ছিল ফালানা-ঢামকানা, নাচনা-গানা, বহুতই খেল-তামাশা। সেই কথাই বলছিলেন বিষেণদেওবাবু।

তারপর বিষেণদেওবাবুর দেওয়া বড় এলাচ চিবোতে চিবোতে ঋজুদা বলল, তুই যে গ্রীনার বন্দুকটা বাছলি, মাচায় বসে অত লম্বা ব্যারেল ঘোরাতে ফেরাতে অসুবিধা হবে না তোর ?

বললাম, তোমার অ্যালবিনো একবার চেহারাখানা দেখাকই না। তারপর তোমার নাম করে ঠুকে দেব নৈবেদ্য। ঠিক পটকে দেবো। দেখো।

ঋজুদা কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকল গম্ভীর হয়ে। বলল, বাঘ বাঘই। একমাত্র বোকারাই বাঘ নিয়ে ছেলেখেলা করে। তারপর জানালা দিয়ে বাড়ির পিছনের নাচঘরের দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে।

কী যেন ভাবছিল ঋজুদা। কোথায় যেন চলে গেছিল। অনেক দূরে। আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে।

অনেকক্ষণ পর, ঘরের মধ্যে ফিরে এসে ঘোর কাটিয়ে বলল, রুদ্র, তুই এবারে কি কি জিনিস এনেছিস তোর সঙ্গে ?

আমি অবাক হলাম। বললাম, এই জামা-কাপড় টুকিটাকি।

না ! কি কি জিনিস এনেছিস সব আমাকে বল এক এক করে। দরকার আছে।

আমি আরও অবাক হলাম।

ভেবে ভেবে বলতে লাগলাম, জিনের ট্রাউজার দুটো, জাঙ্গিয়া, মো......

জামা-কাপড় জুতোটুতো ছাড়া কি এনেছিস ?

পায়জামার দড়িতে গিঁট পড়ে গেছিল, তাড়াতাড়িতে খুলছিল না, আসবার সময় তাই মাকে না বলেই মায়ের কাঁচিটা নিয়ে চলে এসেছি। সেলাই কলের ড্রয়ারে থাকে। ফিরে গেলে হবে আমার উপর এক চোট।

গুড়। ঋজুদা বলল। ভেরী গুড়।

আমার উপরে মা যদি এক চোট নেন তাতে ঋজুদার গুড ভেরী গুড় বলার কি আছে বুঝতে পারলাম না।

ঋজুদা আবার ক্রমশ দুর্বোধ্য হতে শুরু করেছে। এর পর একেবারে চাইনীজ ডিকশনারী হয়ে যাবে বুঝতেই পারছি।

বলল, কি হল ? থামলি কেন ? বলে যা আর কি কি এনেছিস !

আর, আর, আর...আমি ভাবতে লাগলাম...তারপর হঠাৎ মনে হতেই বললাম, আমার ক্যামেরাটা। বড় মামা, পরীক্ষা ভাল করে পাশ করাতে প্রেজেন্ট করেছিল—মোটে এক রীল ছবি তুলেছিলাম কোলকাতায়। তাইই নিয়ে এসেছি হাত পাকাবার জন্যে এখানে।

ফাইন। ঋজুদা বলল। ফিল্ম ভরে এনেছিস ত' ?

হ্যাঁ। ব্ল্যাক এ্যান্ড হোয়াইট ভরা আছে। কালার্ড ফিল্মও এনেছি।

কত স্পীডের ?

টু হান্ড্রেড এ এস এ।

ফাইন। কালার্ড ফিল্মটা কাজে লাগবে বাঘের ছবি তুলতে। বন্দুক নিয়ে তুই বাঘের সামনে দাঁড়াস নীল জিনস আর লাল গেঞ্জী পরে—আমি তোর ছবি তুলে দেব।

চোখের সামনে যেন কল্পনায় দেখতে পেলাম, বিরাট সাদা বাঘটা পড়ে আছে আমার পায়ের সামনে। আর আমি বন্দুক হাতে মৃদু মৃদু হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছি। ভাবনা, ভাবনাই। ভাবনা ত' আর দেখানো যায় না।

পরক্ষণেই ঋজুদা বলল, আর কি এনেছিস মনে করে বল ? টর্চ, ছুরি, ভোজালি ?...

আমি বললাম, নাঃ। তারপরেই মনে হল টেপ রেকর্ডারের কথাটা। বনি এম, আব্বা-গ্রুপ, বী-জীস এবং দ্যা পোলিস-এর ক্যাসেট আর পাঁচমিশেলী বাংলা গানের দুটি ক্যাসেট নিয়ে এসেছিলাম। দিশী টেপরেকর্ডার কিন্তু।

দিশী জিনিস কি খারাপ ? ফোরেন জিনিসের প্রতি আমার দুর্বলতা নেই কোনো। দু-একটা জিনিস ছাড়া, যেমন বন্দুক ইত্যাদি, পাইপের টোব্যাকো...

ঋজুদা যেন বিশেষ উৎফুল্ল হল। বলল, ফারস্ট ক্লাস।

শুনবে নাকি গান ? আমি বললাম।

ঋজুদা বলল, একদম না। তোর এ সব বিজাতীয় চিৎকার ?

আর শোন, বলেই গলা নামিয়ে বলল, বিষেণদেওবাবু গোলমাল পছন্দ করেন না। এখানে টেপ বাজাস না একবারও। বরং কালকে বীটিং-এর পুরো আওয়াজটা টেপ করে নিবি। দারুণ হবে। বীটারদের চিৎকার, স্টপারদের আওয়াজ, তারপর বীটিং-এ তাড়া-খাওয়া পাখি আর জানোয়ারদের চলাচলের এবং গলার আওয়াজ। তোর বন্ধুরা দারুণ ইমপ্রেসড হয়ে যাবে। কত্তদিন থেকে শখ আমাদের দেশের জঙ্গলকে সেন্ট্রাল-থেম করে একটা ভালো ছবি করব। কিন্তু কে দেবে টাকা ?

বলেই বলল, মাঝে, মেট্রোতে, নুন-শোতে কস্তুরী বলে একটা ছবি এসেছিল। দেখেছিলি ?

বড়দের বই ? আমি বললাম।

ঋজুদা রেগে গিয়ে বলল, তুই এখন যথেষ্টই বড় হয়েছিস। আর ন্যাকামি করিস না। তোর মা যদি এখনও তোকে ছোট্ট ছেলেটি ভাবে ত' আমি এবার গিয়ে কথা বলব সীরিয়াসলী। তুই এই ছবিটা দেখবি কখনও সুযোগ পেলে।

কোন্ ছবিটা ? নামই ত' বললে না।

ওঃ। কস্তুরী। বিমল দত্তর ছবি। তাঁরই লেখা স্ক্রিপ্ট, তাঁরই ডিরেকশান। অসাধারণ ছবি। মধ্যপ্রদেশের বস্তারের পটভূমিতে একটি কাল্পনিক পাখিকে নিয়ে গল্প। এরকম লেখা আগে যে কেন কেউ লিখতে পারেননি ; ভাবি তাই।

ছবিটি বোধহয় ঋজুদাকে ভীষণই নাড়া দিয়েছে। ছবিটির কথা মনে পড়ায় অনেকক্ষণ

চুপ করে বসে থাকল ঋজুদা।

তারপর হঠাৎ বলল, তোর কাঁচিটায় কেমন ধার ?

কেন ? নখ কাটবে ? ও যে বিরাট কাঁচি। বললাম না, মার সেলাই-কলের ড্রয়ারে থাকে।

নখ কেন ? কারো নাকও ত' কাটতে পারি। তোর নাকও কাটা যায়। কাঁচিটা বের কর ত' দেখি।

কাঁচিটা বের করে বললাম, দাঁড়াও। আগে যে জন্যে এটাকে আনা সেই কাজটা সেরে ফেলি—পায়জামার দড়িটা.....

হঠাৎ দরজার কাছে কার যেন গলার শব্দ শোনা গেল।

ঋজুদা তাড়াতাড়ি কাঁচিটা বালিশের তলায় লুকিয়ে ফেলল।

আমি অবাক হলাম ঋজুদাকে লক্ষ করে।

দরজার পাশ থেকে গলা খাঁকারি দিল কোনো লোক। জানান দিল যে, সে এসেছে।

ঋজুদা বলল, কওন ?

ব্রিজনন্দন হুজৌর।

ব্রিজনন্দন ? আমার ভুরু কুঁচকে উঠল।

ঋজুদা কোমরে বাঁধা পিস্তলের হোলস্টারের বোতামটা পাঞ্জাবীর তলায় হাত চালিয়ে খুলে দিল। তারপর হাত সরিয়ে এনে আমার বিছানাতে যেমন বসে ছিল, তেমনই বসে বুকের কাছে একটা তাকিয়া টেনে নিয়ে বলল, আইয়ে, পাধারিয়ে। অন্দর আইয়ে।

ব্রিজনন্দন ভিতরে এল। বাইরে তার নাগরা খুলে রেখে।

ঋজুদা বলল, কা সমাচার ? কুছ বোলনা চাহতা হ্যায় আপ।

জী হাঁ। খয়ের...বলে একবার কাশল।

এমন সময় নীচের হলঘর থেকে ভানুপ্রতাপের চিৎকার ভেসে এল ব্রিজনন্দন—ব্রি-জ-ন-ন্দ-ন কা আভি বোলাও। গায়া কাঁহা উল্লু ?

ব্রিজনন্দন তাড়াতাড়ি দৌড়ে বেরিয়ে নাগরা পায়ে গলিয়ে নীচে নেমে গেল। যাওয়ার আগে বলে গেল, ম্যায় ফির আউঙ্গা।

ঋজুদা চলে-যাওয়া ব্রিজনন্দনের দিকে চেয়ে থেকে চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ।

তারপর নিজের মনেই বলল, পইলে দর্শনধারী, পিছলে গুণবিচারী।

মানে ? আমি শুধোলাম।

মানে, প্রথমে মানুষের চেহারাটা অন্য মানুষের চোখে পড়ে। গুণাগুণের বিচার আসে অনেক পরে।

হঠাৎ। এ-কথা ?

এমনিই, মনে হল।

তারপর বলল, ভানুপ্রতাপ ছেলেটাকে ওর মামা একেবারে বকিয়ে দিয়েছে। কি অসভ্যর মত ওর তিন গুণ-বয়সী লোকটাকে উল্লু-ভাল্লু করে ডাকছে শুনলি ? চেঞ্জে এসে যে উল্লু-ভাল্লু-অ্যালবিনোর রাজত্বে পড়ব তা কি করে জানব আগে ?

আমি বললাম, ঋজুদা, কাঁচিটা !

ওঃ। বলেই কাঁচিটা বের করে আমার বাঁ-পা-টা গোড়ালীর কাছে ধরে সাধের জিনের ট্রাউজারটার গোড়ালীর কাছ থেকে খচ্ খচ্ করে ইঞ্চি দুয়েক কেটে দিল।

আমি, এ কি ! এ কি ! করে উঠতেই ঋজুদা বলল, এইটেই স্টাইল। আজকাল আস্ত

জিনস্ কেউ পরে না।

আমার চোখে প্রায় জল এসে গেল।

বললাম, নয়না মাসী দিয়েছিল আমাকে।

তবে ত' নিঃসন্দেহে বস্তাপচা থার্ডরেট জিনিস দিয়েছে। নয়নামাসী ত' বড়লোক। বলিস আরেকটা কিনে দেবে।

তারপরই বলল, কাঁচিটা দিয়ে তোর মা কি কাটে রে ? ব্রিপল-টিপল কাটে নাকি ? এত মোটা জিন্ ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করে কেটে গেল। তাঁবু সেলাই করছেন নাকি তোর মা আজকাল সেলাই-কলে ?

আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছিল। আমি চুপ করেই রইলাম। ঋজুদা বলল, তোর পায়জামা ইমিডিয়েটলী মেরামত করে নিয়ে কাঁচিটা দিয়ে দে। ওটাকে আমি কনফিস্‌কেট করলাম। এরকম কাঁচি সঙ্গে নিয়ে যারা ঘোরে তারা আনডাউটেড্‌লী গাঁট-কাটা।

আমি পায়জামার গিঁট কেটে কাঁচিটাকে ফেরত দিলাম ঋজুদাকে। সঙ্গে সঙ্গে হালকা-সবুজ খদ্দরের পাঞ্জাবীর বিরাট পকেটে সেটাকে ঢুকিয়ে দিল। তারপর বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েই বলল, রুদ্র, ঠিক চারটেতে তৈরী হয়ে থাকবি। আমরা একটু বেরুব।

কোথায় ?

গাড়িতে জল-মবিল, ব্যাটারীর জল সব চেক করে রেখেছিস ? স্টার্ট করেছিলি সকালে ?

হ্যাঁ, আমি বললাম।

বলেই, বললাম, কোথায় ?

যাব কোথাও একটা। ক্যামেরাটা সঙ্গে নিবি।

বলে, আমাকে পুরো সাস্‌পেন্সে রেখে ধীরে সুস্থে চটি ফটর্ ফটর্ পাইপ ভুসভুস আর পায়জামা পাঞ্জাবীতে খস্‌খস্ শব্দ তুলে ঋজুদা আমার ঘর ছেড়ে চলে গেল।

আমি কোলবালিশেত উপর মাথা রেখে শুলাম, একটু ঘুমোব না প্রতিজ্ঞা করে।

একটু পরেই আমার অজানিতে চোখ বন্ধ হয়ে এলো। চোখের সামনের অন্ধকারের মধ্যে একবার করে একটা মস্ত সাদা দাড়ি গোঁফওয়ালা খাসী এসে দাঁড়িয়ে শিং নাড়তে লাগল আর তার বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে তৈরী মুখরোচক খাবারগুলোর নাম মনে করাতে লাগল। কৌরি, চাঁব, পায়া, কবুরা, কলিজা, সিনা এবং মগজ। পরশুরামের লম্বকর্ণর সাদা সংস্করণ আমার চোখের সামনে এত জোরে মাথা ঝাঁকাতে লাগল যে মনে হল তার শিং দুটো আমার মগজ ফুটো করে দেবে।

ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছিলাম, তারপর খাসীটা বলছে যে আমার মগজ খায়, সে আমার মগজ পায়। যে আমার মগজ খায়, সে আমার মগজ পায়। ঘুমের মধ্যেই প্রবল আপত্তি করতে লাগলাম তার খাসী-সুলভ এই কথায়, এমন সময় আমার কানে টান পড়ল। কানটাও কি লম্বকর্ণর হয়ে গেল।

তাকিয়ে দেখি, ঋজুদা।

বলল, ইডিয়ট্। ক'টা বেজেছে ?

লাফিয়ে উঠে দেখি চারটে বেজেছে ঠিক ঘড়িতে।

ঋজুদা বলল, গাড়ির চাবি।

সমস্ত মালোয়ামহলে ঘুম নেমেছে। রাজা-রাজড়ার ব্যাপার। দিবানিদ্রা ছেয়ে ফেলেছে পুরো বাড়িটা। এমনকি বিরাট বসবার ঘরের দেওয়ালে কোনায়-কোনায় যে

অসংখ্য বাঘ ভাল্লুক শম্বর নীলগাই বাইসন স্টাক করা রয়েছে তারাও মনে হলো ঘুমোচ্ছে।

আমি স্টিয়ারিং-এ বসলাম। ঋজুদা বলল, গীমারীয়ার রাস্তা।

গাড়িটা যখন গেট পেরিয়ে বাইরে এল তখন প্রকাণ্ড ফটকের সামনে দাঁড়ানো দুজন বন্দুকধারী দারোয়ান ছাড়া আর কেউই জানলো না যে, আমরা বেরিয়ে এলাম।

দুপুরেও এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। গীমারীয়ার রাস্তাতে মাইল তিনেক যেতেই ঋজুদা বলল, সামনে এক ফার্লং গিয়েই বাঁদিকে একটা ফরেস্ট রোড পাবি। তাতে ঢুকে যাবি। মাইল খানেক গিয়ে একটা পাহাড়ী নদী পাবি। তার উপর কজওয়ে আছে একটা। কজওয়ের পাশে গাড়ি থামিয়ে কাঁচ তুলে গাড়ি লক্ করে দিবি।

দেখতে দেখতে জায়গাটাতে পৌঁছে গেলাম। হাবভাব দেখে মনে হল এই জঙ্গল ঋজুদার নখদর্পণে। গাড়ি থেকে নেমে, পায়জামা পাঞ্জাবী পরে হাওয়াই চটি পরে ফটর ফটর খসর খসর করতে করতে ঋজুদা নদীর বুক ধরে জঙ্গলের ভিতরের দিকে এগোতে লাগল। নদীর বালিতে চোখ রেখে।

আমি বললাম, কি ব্যাপার?

ঋজুদা বলল, এদিকে আর নদী নেই। এই নদীতে বাঘের পায়ের দাগ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। কারণ এ নদী না পেরিয়ে বাঘের উপায় নেই। আর এই নদী-বরাবরই মাচা বাঁধা হয়েছে কালকের শিকারের। মাচাগুলো দেখা যাবে।

আমি বললাম, ঋজুদা। খালি হাতে! প্রত্যেকদিন সন্ধের সময় বাঘটা ডাকাডাকি করে।

ঋজুদা বলল, সঙ্গে থ্রি-সেভেনটিন্ পিস্তল আছে। এত ডাকাডাকি করার পরও যদি সাড়া না দিস্ তাহলে কোলকাতার লোকদের অভদ্র ভাববে না?

তারপর একটু গিয়ে বলল, তোর বুঝি ভয় করছে নিরস্ত্র বলে? তাহলে এটা রাখ।

বলেই, পকেট থেকে কাঁচিটা বের করে আমাকে দিল।

আমি বললাম, ভাল হচ্ছে না কিন্তু। সবসময় এরকম ভালো লাগে না। অতবড় বাঘ।

ঋজুদা বলল, বাঘ বড় হলেই যে ভয়টাও তার সাইজের হতে হবে এমন ত' জানা ছিল না। ভাল চেলাই জুটেছে আমার।

আমি চুপ করে রইলাম।

বালির উপরে চোখ রেখে একটু গিয়েই ঋজুদা থেমে গেল। বলল, দ্যাখ্ শম্বর। অনেকগুলো শম্বরের খুরের দাগ দেখলাম বালিতে। বাঁ দিকের জঙ্গল থেকে হনুমান ডাকছিল হুপ্‌হাপ্ করে। ডানদিকের জঙ্গল থেকে ময়ূর। আর একটু এগোতেই ডানদিক থেকে একটা বার্কি-ডিয়ার ব্বাক্ ব্বাক্ করে ডেকে উঠে সমস্ত জঙ্গলকে চমকে দিল।

আমি ঋজুদার পাঞ্জাবীর কোনা ধরে টেনে বললাম, নিশ্চয়ই বাঘ দেখেছে।

ঋজুদা পাঞ্জাবীটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, পাঞ্জাবী নিয়ে ফাজলামি করিস না। মোটে দুটো পাঞ্জাবী এনেছি।

আরো একটু গিয়ে একটা বুড়ো হায়নার থাবার দাগ দেখা গেল। তারপর মাচাগুলো চোখে পড়ল একের পর এক। একটা থেকে আরেকটা দেখা যায় না। নদীটা বাঁক নিয়ে এখানে অর্ধচন্দ্রাকারে বয়ে গেছে। শাল, পিয়াশাল, অর্জুন, গামহার, ক্ষয়ের, শিশু এসব জঙ্গলই বেশী। শিমুল আর হরজাই গাছও আছে কিছু। সবচেয়ে বেশী শাল। আর

সেগুন একেবারে নেই বললেই চলে।

প্রথম মাচাটার কাছে এসেই ঋজুদা থমকে দাঁড়াল। বলল, এ্যাই দ্যাখ।

বালিতে তাকিয়ে দেখলাম, উরে ব্বাবাঃ! বিরাট বড় একটা বাঘের পায়ের থাবার দাগ। নদীটার এপাশ থেকে ওপাশে গেছে। আবার ওপার থেকে এপাশে গেছে।

ঋজুদা হাঁটু গেড়ে বসে ভাল করে দাগগুলো দেখতে লাগল মাথা নীচু করে। আমি কাঁচি হাতে দাঁড়িয়ে, বাঘ এলে, কাঁচি দিয়ে বাঘের গোঁফ কাটব না লেজ কাটব তাই ভাবতে লাগলাম। প্রত্যেকটা মাচার সামনেই বাঘ নদী পারাপার করেছে। দুপুরের বৃষ্টিতে দাগগুলো ক্ষয়ে ক্ষয়ে গেছে। ভেঙে গেছে, বালি সরে যাওয়াতে। ঋজুদা বলল, কতগুলো ছবি তুলে নে এই দাগের। বিভিন্ন দাগের।

শেষ মাচা অবধি গিয়ে আবার আমরা ফিরলাম।

শেষ মাচার সামনে এসে ঋজুদা আবারও নীচু হয়ে বসল।

আমাকে বলল, কি দেখছিস? দেখতে পাচ্ছিস কিছু?

আমার আর দেখার ইচ্ছা ছিলো না। পায়ে হেঁটে খালি-হাতে এত বড় বাঘের শীচরণের ছাপ দেখার ইচ্ছেও নেই আমার।

আসলে যারা বনে-জঙ্গলে রাইফেল-বন্দুক নিয়ে ঘুরে অভ্যস্ত, তারা খালি হাতে বড়ই অসহায় বোধ করেন। কতখানি অসহায় যে বোধ করেন, তা যাঁরা জানেন, তাঁরাই জানেন।

ঋজুদাকে বললাম, দেখার কি আছে? বাঘ।

ঋজুদা উঠে দাঁড়িয়ে পাইপটা ধরালো।

বলল, বাঘ ত' ঠিকই আছে। বাঘ ত' বটেই। কিন্তু আর কিছু?

আমি ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, বাঘের পায়ের দাগের আশেপাশে মানুষের জুতোর ছাপ। কোনো শিকারী বা ফরেস্ট-গার্ডের হবে।

বললাম, দেখলাম।

জুতোটা, কি জুতো বলতে পারিস?

বোধহয় বাটা কোম্পানীর এ্যাম্বাসাডর।

ইডিয়ট্। তাছাড়া এ্যাম্বাসাডর জুতো পরে কেউ জঙ্গলে আসে না। আসা উচিত নয় অন্তত।

—কি তবে?

—এ জুতো ডাক-ব্যাক-কোম্পানী তৈরী করে। জলে-কাদায় হাঁটবার জন্যে। ছবি তোল্।

জুতোর দাগের? বোকা বনে গুধোলাম আমি।

তাই-ই ত' বলছি। ঋজুদা বলল।

তারপর বলল, শোন্, আরও একটা কাজ করবি। বীটিং শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুই তোর টেপ-রেকর্ডারিটা চালিয়ে দিবি। একদিক শেষ হলে, রিওয়াইন্ড করে দিবি।

আমি বললাম, বাঃ, আমার সাধের গানগুলো।

ডেপোমি করিস না। ওগুলো ইরেজড হয়ে গেলে যাবে। কোলকাতায় গিয়ে আবার টেপ করে নিস্। যা বললাম, তা করতে ভুল না হয় যেন।

গাড়িতে ফিরে এসে গাড়ি খুলে গাড়ি ঘুরিয়ে নিলাম আমরা। বেশ কিছুদূর আসার পর ঋজুদা গাড়িটা রাখতে বলল, তারপর আমাকেও নামতে বলে, জুতো খুলতে বলে নিজেও

চটি খুললো। দুটো শালের চারা উপড়ে নিয়ে আমাকে একটা দিয়ে নিজেও একটা নিল। তারপর নিজের হাতের শালের চারাটাকে ঝাঁটার মত করে ব্যবহার করে গাড়ির চাকার দাগ মুছতে মুছতে নদীর দিকে যেতে লাগল। আমি একদিকের চাকার দাগ মুছছিলাম আর ঋজুদা অন্যদিকের। অতখানি রাস্তা ঝাঁট দিতে দিতে কোমর ধরে গেল। এদিকে অন্ধকারও হয়ে আসছিল। গাছের ছায়ারা দীর্ঘতর হচ্ছিল। বনের গভীর থেকে তিতির আর ছাতারের দল একই সঙ্গে চেঁচিয়ে মাথা গরম করে দিচ্ছিল আমাদের।

নদী অবধি গাড়ির চাকার দাগ মুছে ফেলে রাস্তা ছেড়ে রাস্তার পাশে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কেটে-রাখা অগভীর নালা ধরে আমরা ফিরে এলাম ঋজুদার কথামত।

এই নালার মধ্যে প্রথম গরমে দু' পাশের পাতা পোড়ায় ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকেরা। আর বর্ষায় জল নিকাশ হয় এই নালা দিয়ে।

গাড়ির কাছে যখন পৌঁছে গেছি, ঋজুদা তখন বলল, গাড়িটাকে এখানে একবার ঘোরা।

কেন?

যা বলছি কর্ না। ধমক দিল ঋজুদা বিরক্তির সঙ্গে। তুই বড় বেশী বুঝছিস আজকাল।

গাড়িটাকে আবারও উল্টোদিকে ঘুরিয়ে পরে আবার যেদিকে মুখ ছিল সেদিকে করলাম। এবার ঋজুদা বলল, সাবধানে চাকার দাগ এমন করে মুছে দে শালের চারা দিয়ে, যাতে মনে হয় যে, আমরা শুধু এই পর্যন্তই এসে বসে, তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গেছি।

যেমন বলল ঋজুদা, তেমনই করলাম।

হঠাৎ ঋজুদা বলল, তোর কাছে ফেলে দিয়ে যাবার মত কিছু আছে?

মানে?

এই রুমাল-টুমাল। চকোলেট আনিসনি সঙ্গে।

এই গোলমেলে কথাবার্তায় আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। সবেধন মাত্র রুমালটি বের করলাম। ঋজুদা ছুঁড়ে ফেলে দিল সেন্ট-মাখানো রুমালটাকে রাস্তার পাশের মস্ত একটা শিমুল গাছের গোড়াতে। তারপর আমাকে বলল, চল, ওখানে গিয়ে বসি। ঐ গাছের গোড়ায়। আচ্ছা কি চমৎকার শিমুলটা দেখেছিস। কিরকম ঋজু, সটান চেহারা। আমার ঠাকুর্দা নাকি আমাদের দেশের বাড়ির বাগানের একটা শিমুলগাছের দিকে চেয়েই আমার নাম দিয়েছিলেন ঋজু।

আমি বললাম, শুধু শিমুলই ঋজু হতে যাবে কোন্ দুঃখে, ডবা বাঁশও ঋজু। ন্যাড়া তালগাছও ঋজু।

ঋজুদা চুপ করে রইল। হয়ত বুঝল, আমাকে ঘাটানো ঠিক হবে না আর।

গাছের গোড়ায় বসে বার দুয়েক ঋজুদা তার পাইপের পোড়া টোব্যাকো খুঁচিয়ে ফেলল, ঐ দারুণ গাছেরই গোড়াতে। তারপর কি মনে করে নিজের পুরনো হয়ে-যাওয়া হাওয়াইন্ চপ্পলের স্ট্রাপটাকে নিজেই ছেঁড়ার চেষ্টা করতে লাগল।

আমি পকেট থেকে তাড়াতাড়ি কাঁচিটা বের করলাম, ঋজুদার কষ্ট হচ্ছে দেখে।

ঋজুদা বলল, থিংক রুদ্রদ্রবাবু। থিংক আ হোয়াইল। বজরঙ্গবলী মাথা একটা সকলকেই দেন, কিন্তু সেই মাথাটা কাজে লাগায় খুবই কম লোক। ভাবতে চেষ্টা কর্—কার্য হলেই কারণ থাকে, একটা কিংবা অনেকগুলো।

তখন আমার মনে হল, তাই ত'। কাঁচি দিয়ে কাটলে যে কেউ একটু নজর করে দেখলেই বুঝবে যে, কাঁচি দিয়ে ইচ্ছে করে এটাকে কাটা হয়েছে। হঠাৎ ছিঁড়ে যায়নি।

টানাটানি করতে করতে চটিটা সত্যিই ছিঁড়ে গেল। ঋজুদা তখন দু' পাটি চটিই ঐ গাছতলাতে ফেলে রেখে খালিপায়ে এসে গাড়িতে উঠল। আমি জুতো পরে নিলাম। তারপর গাড়ি স্টার্ট করে ফেরার পথ ধরলাম।

ঋজুদা বলল, আরেকটা কথা রুদ্র। এই ফিল্মটা এক্ষুনি খুলে নিজের পকেটে রাখবি। সবগুলো এক্সপোজার দেওয়া না হলেও। আর কাল বীটিং শেষ হওয়া মাত্রই যে ক্যাসেটটাতে বীটিং-এর আওয়াজ রেকর্ড করাবি সেটাও খুলে পকেটে ভরে, অন্য কোনো ক্যাসেট—যাতে গান আছে, তা ভরে রাখবি তোর রেকর্ডারে।

কেন!

আবার কেন?

বললাম, আচ্ছা!

ঋজুদা বলল, তাড়াতাড়ি চল্। চা না খেয়ে মাথা ধরে গেছে।

মালোয়ামহলে পৌঁছতেই রীতিমত জেরার সামনে পড়তে হল আমাদের দুজনকে। খালি পায়ে ঋজুদাকে নামতে দেখেই বিষেণদেওবাবু আর ভানুপ্রতাপ হৈ-হৈ করে উঠল।

ঋজুদা বলল, আর বলবেন না, আপনার রুদ্রদ্রবাবুকে নিয়ে পাগল হয়ে গেলাম। ও আবার কবিতা লেখে। নির্জনে জঙ্গলের প্রাণের শব্দ শুনবে বলে একটা ফরেস্ট রোডে ঢুকে গাড়ি নিয়ে এতক্ষণ বসে ছিলাম। কবিত্ব শেষ হলে বলল, কার বডি বেশী ফিট্ দেখা যাক। বলেই, লাফিয়ে শিমুলের ডাল ধরার কম্‌পিটিশান লাগাল আমার সঙ্গে। ও আর আমি। ঐ করতে গিয়েই এই অবস্থা! হাওয়াই-চপ্পলের এত ধকল কি সয়? খামোকা কোমরে এমন টানও লাগল যে, কাল ভোরে উঠতে পারলে হয় বিছানা ছেড়ে।

বিষেণদেওবাবু বললেন, নিমের তেল দিয়ে আপনাকে একেবারে এমন মালিশ করাব আমার নাপিত মহাবীরকে দিয়ে যে, কাল সকালে দেখবেন ওয়েলার ঘোড়ার মত দৌড়চ্ছেন আপনি।

ঋজুদা হাসল। বলল, তার আগে শীগ্‌গিরী চা। আর চটি।

বিষেণদেওবাবু একজন বেয়ারাকে দিয়ে ঋজুদাকে তাঁর কামরায় পাঠালেন চটি পছন্দ করে নিয়ে আসতে।

কিছুক্ষণ পর ঋজুদা খুব খুশী খুশী মুখে ফিরে এল একজোড়া কোলাপুরী চটি পায়ে গলিয়ে—। কিন্তু গোড়ালীটা মাটিতেই রইল। বিষেণদেওবাবুর পা ঋজুদার চেয়ে ছোট।

বিষেণদেওবাবু তাকিয়ে রইলেন লজ্জিত হয়ে।

ঋজুদা বলল, চটি জোড়া আপনার দারুণ। শুধু একটু ছোট হয়েছে।

বলেই বলল, আপনার পায়ের সাইজ কত?

সাত। বিষেণদেওবাবু বললেন।

আর তোমার ভানু? ভানুপ্রতাপের দিকে চেয়ে বলল ঋজুদা।

আমারও সাত।

ঋজুদা বলল, আমার আট।

বিষেণদেওবাবু বললেন, এক সাইজ হয়েই ত' মুশকিল হয়েছে। কোনো জুতোই কি আর আমার নিজের আছে? যে জুতো কিনি, তাই-ই নিয়ে নেয় ভানু। মহা বিপদেই

পড়েছি।

ভানুপ্রতাপ দুষ্টুমির হাসি হাসল।

ঋজুদা বলল, কথায় বলে, মামা-ভাগ্নে যেখানে, আপদ নেই সেখানে।

এটা যা বলেছেন। লাখ কথার এক কথা। মামা-ভাগ্নে দুজনেই সমস্বরে বলে উঠল।

এরপর চা এল। সঙ্গে বোঁদে আর মাঠরী। গোরখপুরী চা। নানারকম মশলা-টশলা দিয়ে।

ঋজুদা বলল, ফারস্ট ক্লাস চা। তারপর তিন-চার কাপ চা খেল ঋজুদা এবং আমাকে অবাক করে প্রায় দুশো গ্রাম মত মাঠরীও মেরে দিল।

আমি বললাম, অত খেও না ঋজুদা, পেট আপসেট করবে।

বিষেণদেওবাবু বললেন, কিচ্ছু হবে না, একেবারে বাড়িতে তৈরি খাঁটি ঘি দিয়ে বানানো।

আমি বললাম, সেইখানেই ত' বিপদ। খাঁটি জিনিস খাওয়া আমাদের যে অভ্যেসই নেই।

বিষেণদেওবাবু আর ভানুপ্রতাপ হেসে উঠলেন।

ঋজুদা আমার দিকে একঝলক এ্যাপ্রিসিয়েশানের হাসি হেসে, আমার যে বুদ্ধি শনৈঃ শনৈঃ খুলছে এমন একটা নীরব ইঙ্গিতও করে বলল, আরে, হলে হবে। এমন ভাল মাঠরী সেই কবে খেয়েছিলাম ছোটবেলায়, গিরিডিতে!

চা-টা খাওয়া হলে ঘর ভর্তি ট্রোফিগুলোর দিকে তাকিয়ে ঋজুদা বলল, আপনাদের পরিবারের এই এক একটা ট্রোফি ত' এক-এক ইতিহাস। কি বলেন বিষেণদেওবাবু?

তা ত' বটেই। কী সব দিনই ছিল। বিহারের গভর্নর শিকারে আসতেন আমার বাবার আমলে এই জঙ্গলে। আমাদের এই গরীবখানাতে ডিনার দেওয়া হত তাঁর অনারে। কত জায়গার রাজা-রাজড়ারা আসতেন।

বসবার ঘরের দেওয়ালে, মেঝেতে, ঘরের বিভিন্ন কোনাতে বিভিন্ন সাইজের বিভিন্ন ভঙ্গিমাতে স্টাফ্ করা বাঘ ও অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের চামড়া, শিং, মাথা, পা ইত্যাদি ছিল। পশ্চিমের দেওয়ালের গা-থেকে ঝোলানো একটা প্রকাণ্ড বড় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মাথা শুদ্ধু চামড়া দেখিয়ে ঋজুদা বলল, এই বাঘটা কোথায় মেরেছিলেন, এত বড় বাঘ বড় একটা দেখা যায় না।

বিষেণদেওবাবুর চোখে স্মৃতি ঝলসে উঠল। বললেন, এই বাঘ মেরেছিলাম পালামৌর বাংকার জঙ্গলে। সবে গরম পড়েছে। দুপুরবেলা বীটিং হচ্ছে। মাটিতে বসে আছি একটা ফেলাউদা ঝোপের পাশে, মুরগী মারব বলে। আমার হাতে শট্ গান। তাতে ডানদিকের ব্যারেলে এল-জি আর বাঁদিকের ব্যারেলে চার নম্বর ভরা আছে। বলা নেই, কওয়া নেই, এক ঝাঁক মুরগী তাড়িয়ে নিয়ে, প্রায় বীটিং শেষ হওয়ার সময়ে তিনি বেরোলেন। সে এক অভিজ্ঞতা। এখনও মনে হলে হাতের পাতা ঘেমে ওঠে উত্তেজনায়।

কত বড় ছিল বাঘটা? মানে, মাপের কথা বলছি। ঋজুদা শুধোল।

দশ ফিট ছ' ইঞ্চি। ওভার দ্যা কার্ভস্। বিষেণদেওবাবু বললেন।

তারপর বললেন, ঠিক এই মাপেরই একটি ট্রোফি আছে এ তল্লাটে হাজারীবাগে। তখন হাজারীবাগের এস পি ছিলেন সত্যচরণ চ্যাটার্জি সাহেব। ভারী ভাল লোক। তাঁরই ছেলে মেরেছিল বাঘটাকে সিতাগড়া পাহাড়ের নীচে, টুটিলাওয়ার জমিদার ইজাহারুল

হক-এর সাহায্যে। এখনও চামড়াটা আছে চ্যাটার্জি সাহেবের ক্যানারী হিল্ রোডের বাড়ির বসবার ঘরে।

ঋজুদা হঠাৎ ঐ চামড়াটার দিকে এগিয়ে গেল। পাইপের ধুঁয়ো ছেড়ে মুখ ঘুরিয়ে বলল, একটু ভাল করে দেখি। এতবড় বাঘ আমিও ত' কখনও মারিওনি, দেখিওনি।

ভানুপ্রতাপ এবং বিষেণদেওবাবু দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলেন, হাত দেবেন না, ভীষণ ধুলো ত' ধুলো লেগে যাবে। পোকাও হয়েছে।

বিষেণদেওবাবু বললেন, তাছাড়া চুহার উপদ্রবে এখানে ট্রোফি রাখাই মুশকিল। বাঘের কান খেয়ে দিচ্ছে, ভালুকের থাবা, চিংকারা হরিণের নাক, মহা মুশকিলেই পড়েছি। ইয়াব্বড়-বড়। দেখলে ভয়ই করে।

ঋজুদা ফিরে এল বাঘের চামড়াটার কাছ থেকে।

ফিরে এসে, আমাকে বলল, যা-যা, দেখে আয় রুদ্র কাছ থেকে। দেখার মত জিনিস বটে।

আমিও দেখে ফিরে আসার পর ঋজুদা জিজ্ঞেস করল, এত ভাল ট্যানিং এবং স্টাফিং ত' আজেবাজে কোম্পানীর দ্বারা হবে না। আমি ত' এইজন্যেই, শিকার যখন করতাম, তখন আমার সব ট্রোফি পাঠাতাম ম্যাড্রাস এর ভ্যান্-ইন্‌জেন্ এন্ড ভ্যান-ইন্‌জেনে।

ভানুপ্রতাপ দুটো বড়ি গিললেন জল দিয়ে। আমরা সকলেই ওঁর দিকে তাকালাম। উনি নির্বিকার। বিষেণদেওবাবু ওঁর দিকে তাকিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বললেন, কি যে করছিস তুই! আত্মহত্যা সবচেয়ে বড় পাপ! তোর জন্যেই মরতে হবে আমার। আর কোনোই উপায় নেই দেখছি।

ভানুপ্রতাপ বললেন, আমি ত' মরতেই চাই। আমার বাঁচতে ভালো লাগে না। তোমাকে ত' বলেছি। আমার ব্যাপারে তুমি মাথা গলিও না। যথেষ্ট বড় হয়েছি আমি। এসব আর ভালো লাগে না দশজনের সামনে। আমি কি মাইনর? না তোমার ওয়ার্ড?

বিষেণদেওবাবু আমাদের সামনে একটু অপমানিত ও লজ্জিত বোধ করলেও, তা গায়ে না-মেখে বললেন, যা খুশী তুই কর, তবে যাই-ই বলি, তোর ভালোর জন্যেই বলি।

ঋজুদা ফেলে-আসা কথায় ফিরে গিয়ে কথার খেই ধরিয়ে বলল, আপনিও কি আপনার সব ট্রোফিই ভ্যান্-ইন্‌জেনে পাঠান?

না, না। আমরা আমার বাবার আমল থেকেই পাঠাই কোলকাতায়। এক আর্মেনীয়ান সাহেবের কোম্পানী ছিল। সাহেব মরে গেছেন বহুদিন। ছেলেরাই বোধহয় মালিক এখন! কি যেন নাম ছিল সাহেবের? ও হ্যাঁ! মনে পড়েছে, ক্রেভিয়ান। আর তাঁর ম্যানেজার ছিলেন হালদারবাবু। এখনও নিশ্চয়ই আছেন। বহুদিন ত' আর শিকার-টিকার করা হয় না। অনেক বছর দেখাশুনা নেই ওঁদের সঙ্গে।

ঋজুদা বলল, বাঃ, ওঁরা ত' দারুণ কাজ করেন দেখছি। আগে জানলে...

দারুণ! বললেন বিষেণদেওবাবু।

ভানুপ্রতাপ একটা হাই তুলে বললেন, অ্যালবিনোর কথা বল তার চেয়ে। যত্ত সব মরা-বাঘ নিয়ে পড়েছো তোমরা।

আমি বললাম, আপনি দেখেছেন অ্যালবিনো বাঘটাকে?

হুঁ। দু' দিন।

মারলেন না কেন?

বাঘ দেখলেই মারতে হবে নাকি? মামারই মারামারি বেশী পছন্দ। অবশ্য ঋজুবাবুকে

মলোয়ামহলের ভেট্ এই বাঘ। বাঘ মারতে কি আছে? ও ত বাঁচোকা খেল্। আমার প্রথম বাঘ আমি কত বছর বয়সে মারি জানো?

কত? আমি চোখ বড় করে বললাম।

দশ বছর বয়সে। আমার মায়ের পাশে বসে, মায়েরই মাচা থেকে।

তা বটে। বিষেণদেওবাবু বললেন, আমার বোন শুভাও বাঘ মেরেছিল ঠিক দশ বছর বয়সেই, আমারই পাশে বসে।

ঋজুদা বলল, ঐভাবে সব বাঘ মারলেন বলেই ত' আজ এই অবস্থা। এ অঞ্চলে ক'টা বাঘই বা আছে এখন?

বিষেণদেওবাবু ঋজুদার কথাতে আহত হলেন।

বললেন, আরে, বাঘ না মারলে আমাদের সময়ে ছেলেমেয়ের বিয়ে পর্যন্ত হতো না। জমিদারীর গেঁছু-বাজরার মত বাঘও আমাদের সম্পত্তি ছিল। নিজেদের জমিদারীর বাঘ মেরেছি তার আবার জবাবদিহি করব কার কাছে?

ঋজুদা বলল, রাগ করলেন নাকি?

বিষেণদেওবাবু জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, রাগ করার কি আছে?

কথা ঘোরাবার জন্যে আমি ভানুপ্রতাপকে বললাম, কেমন দেখতে অ্যাল্‌বিনো বাঘটা?

মনে হল, ভানুপ্রতাপও ঋজুদার উপর চটেছিল। আমার কথার জবাব না-দিয়ে বলল, তাহলে দেখছি ঋজুবাবুর জন্য রেখে-না-দিয়ে এতদিনে মেরে দিলেই পারতাম অ্যাল্‌বিনোটা!

ঋজুদাও রেগেছে মনে হল। বলল, বাঘ মারা এখন বে-আইনের কাজ। আমার বাঘ মারবার শখ নেই। বীটে যদি অন্য কোনো জানোয়ার বেরোয়, মানে শুয়োর কি ভাল্লুক, তবেই আমি মারব। শুয়োর ভাল্লুকের পারমিট ত' দিচ্ছে কিছু কিছু আজকাল। বাঘ মারতে হয় ত' রুদ্রই মারুক। সুন্দরবনেই ও কেবল মেরেছে একটা। অবশ্য ম্যান ইটার বাঘ। ও মারলেই আমার মারা হবে। আমি শুধু তোমাদের সঙ্গে থাকব। আবহাওয়া বেশ জটিল হয়ে উঠছিল।

আমি আবার ভানুপ্রতাপকে বললাম, অ্যাল্‌বিনো কেমন দেখতে তা ত' বললেন না?

ভানুপ্রতাপ বললেন, ছাই-ছাই গায়ের রঙ—কটা চোখ। পোল্লায় বাঘ!

ঋজুদা একটু আগের উত্তেজনা সামলে নিয়ে, অ্যাল্‌বিনো দিনের গল্প শুরু করল বিষেণদেওবাবুর সঙ্গে।

বলল, বিষেণদেওবাবু, সেই পূর্ণিমার রাতে খলকতুম্বী মাইনের পাশে যে বড় শিঙাল শম্বরটা মেরেছিলেন আপনি, মনে আছে? অতবড় শম্বর আমি জীবনে দেখিনি। নর্থ আমেরিকান মুজ-এর মত দেখতে।

বিষেণদেওবাবু বললেন, আপনি ভুলে গেছেন সব। তখন মাইকা মাইনসের লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার ছিলেন মিস্টার বিজাপুকার। মারাঠী ভদ্রলোক। মনে পড়েছে? শটগানের দু' ব্যারেলেই বল ব্যবহার করতেন উনি। রাইফেল দেখতে পারতেন না দু' চক্ষে। ঐ বিজাপুকার সাহেবই মেরেছিলেন শম্বরটা। মেরে, জোর করে ট্রোফিটা আমাকে প্রেজেন্ট করেছিলেন।

তাই নাকি? ঋজুদা বলল, আমার ধারণা ছিল আপনিই যেন মেরেছিলেন।

বিষেণদেওবাবু বললেন, না, না। হি ওজ আ ওয়ান্ডারফুল শট্।

গল্পে গল্পে রাত অনেক হল। বেয়ারা এসে জিজ্ঞেস করল খাওয়ার লাগাবে কি-না।

বিষেণদেওবাবু ঋজুদার দিকে চেয়ে বললেন, ইজাজৎ দিজিয়ে।

ঋজুদা হাসলেন। বললেন, চলুন যাওয়া যাক্।

বাখরখানি রোটি, কালিতিতিরের কাবাব, পাকা পণ্ডিত রুইয়ের রেজালা, শম্বরের মাংসের আচার আর বেনারসের রাবড়ি দিয়ে নমঃ নমঃ করে আমরা ডিনার সারলাম।

বিষেণদেওবাবু বললেন, রাতে আর বিশেষ কিছু করতে পারা গেলো না। কাল ত' সকলকেই ভোরে উঠতে হবে। সেইজন্যেই রাতের খাওয়াটা ইচ্ছে করেই নাকি অত্যন্ত হালকা করেছেন আজ। কালকের ভোজ্ হবে জবরদস্ত।

ভানুপ্রতাপ বলল, মামা ঈত্তরই—ঘীল্-এর ডিকাণ্টারটা বাইরে বের করে রেখো।

আমি বললাম, ঈত্তরই ঘীল্? সেটা আবার কি আত্তর?

ঋজুদা হাসল। ভানুপ্রতাপও হাসলেন আমার কথাতে। তারপর ভানুপ্রতাপ বললেন মৃত্তিকা-গন্ধী-ঈত্তর। ঐ ঈত্তর গায়ে লাগিয়ে, বাঘ-শিকারে যাই আমরা। মানুষের গা-দিয়ে মাটির গন্ধ বেরোয় হাওয়া যেদিকেই থাকুক না কেন বাঘ শিকারীদের গায়ের গন্ধ পায় না।

থ' হয়ে গেলাম শুনে। রাজা-রাজড়াদের ব্যাপারই আলাদা।

খাওয়া দাওয়ার পর আমরা উপরে এলাম। ঋজুদা ঘরে ঢুকেই বলল, কাঁচিটা ফেরত দিলি না আমাকে?

আমি সত্যি-সত্যিই গাঁট-কাটার মত মুখ করে কাঁচিটা ফেরত দিলাম ঋজুদাকে।

ঋজুদা বলল, রুদ্রদ্দরবাবু, কেস্ খুব গোলমালের ঠেকছে। তোর জন্যেই গোয়েন্দাগিরিতে ফেঁসে গেলাম। আর তোর জন্যেই ঈজ্জত ঢিলে হবে। সব কাজ কি সবাইকে দিয়ে হয়?

আমি বললাম, যত দোষ, নন্দের ঘোষ।

এই কথাটা ঋজুদারই এক পাঞ্জাবী বন্ধুর কাছ থেকে শেখা। একটু একটু বাংলা শিখেই ভদ্রলোক কথায় কথায় এইটে বলেন। নন্দ ঘোষ না বলে, বলেন, নন্দের ঘোষ।

ঋজুদা বললে, বসবার ঘরের স্টাফ-করা বড় বাঘটাকে তুই ভাল করে দেখেছিলি?

কোন্ বাঘ? দেওয়ালে যেটা টাঙানো আছে?

হ্যাঁ। ঋজুদা আমার চোখের দিকে চেয়ে বলল।

দেখেছিলাম।

অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়ল?

না ত'?

আরও খাসীর মগজ খা! বলল, ঋজুদা।

তারপর বলল, শুনলি ত' এখানে ভীষণ চুহা। সব ট্রোফির নাক, কান, লেজ খেয়ে যাচ্ছে। রাতে সাবধানে শুয়ে থাকিস। ঘুমের মধ্যে কার কি খেয়ে যায়, কে বলতে পারে?

তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, কাল কিছু একটা ঘটে, বুঝলি। তবে, কি যে ঘটবে, আর কে যে ঘটাবে কিছুই বুঝতে পারছি না।

আমি বললাম, যা কিছু ঘটুক। অ্যাল্‌বিনো বাঘটা মারা পড়ুক আর নাইই পড়ুক, একবার দেখতে পেলেই আমি খুশী।

ক'জনের ভাগ্যে এমন সৌভাগ্য হয়। বলো?

ঋজুদার পাইপটা নিভে গেছিল, দেশলাই জ্বেলে ধরাতে ধরাতে বলল, দেখতে পেলে

ত' আমিও খুশী হতাম। কিন্তু বোধহয় আমাদের দেখা হবে না তার সঙ্গে।

অতগুলো পায়ের দাগ—রেগুলার যাওয়া-আসা করছে আর দেখাই হবে না বলছ তুমি ?

আমি মনমরা হয়ে বললাম।

ঋজুদা নিজের মনেই বলল, কথায় বলে, সাপের লেখা ; বাঘের দেখা। অ্যাল্‌বিনো আমাদের ইচ্ছেপূরণ করবে বলে ত' মনে হয় না আমার। তবে, দ্যাখ্, এখন তোর কপাল।

তারপর বলল, নে, এবার শুয়ে পড়। কোনো দরকার হলে আমাকে ডাকিস। চললাম আমি।...

এমন সময় দরজার কাছে দুপুরবেলার মতই গলা খাঁকারী দেবার শব্দ পাওয়া গেল।

ঋজুদা বলল, আইয়ে ব্রিজনন্দনজী, পাধারিয়ে।

ব্রিজনন্দন নাগরা খুলে ভিতরে এসেই বলল, এই বাড়িতে ভূত আছে, চারপাশে, নাচঘরে, সব জায়গাতে ভূত আছে। আপনারা রাতে একদম ঘরের বাইরে বেরোবেন না।

ভূত ? আমি অবাক হয়ে ঋজুদার দিকে তাকালাম।

ঋজুদা ব্রিজনন্দনের দিকে। তারপর ঋজুদা বলল, কে পাঠিয়েছে আপনাকে আমাদের কাছে ?

বিষেণদেওবাবু এবং ভানুপ্রতাপ দুজনেই। আসলে, কথাটা বলবেন কী না তাই শোচতে শোচতেই ওঁদের সারাদিন গেছে।

ঋজুদা আমার দিকে এক ঝলক তাকিয়েই ব্রিজনন্দনকে বলল, কিরকম ভূত ? ভূত না পেত্নী ? কোন চেহারায় দেখা দেয় তারা ?

ব্রিজনন্দন দু' কানের কাছে দু' হাত তুলে ভিক্ষা-চাওয়ার মত হাতের পাতা দু'দিকে মেলে ধরে বলল, রাতের বেলা ওরকম ঠাট্টা-তামাশা করবেন না হুজৌর্। কখন কি হয়, বলা কি যায় ?

তারপর গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, ভানুপ্রতাপের বাবা ঘোড়া থেকে পড়ে এখানেই মারা গেছিলেন। তাঁকে মাঝে মাঝেই ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াতে দেখা যায় গভীর রাতে। এই মহলের চারপাশে। নাচঘর থেকে বাঈজীর গানও ভেসে আসে কখনও সখনও। বিষেণদেওবাবুর বাবা গয়ার এক বাঈজীকে খুন করেছিলেন ঐ নাচঘরে। সেই গায় গান।

বিষেণদেওবাবু এত সাহসী শিকারী হয়েও ভূত মানেন ?

শিকারের সাহস আলাদা, আর ভূত-প্রেতের ব্যাপার আলাদা। বিষেণদেওবাবু কত দেব-দেবীর কাছে পুজো চড়িয়েছেন—মহলের সব নোকর-বেয়ারারা জানে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি।

ঋজুদা বলল, এইসব ভূত-পেত্নীরা কবে থেকে উপদ্রব শুরু করেছে ?

ব্রিজনন্দন বলল, মাসখানেক হলো বলেই ত' শুনেছি। আমি ত' এখানে থাকি না। আমার সবই শোনা কথা।

ঐ নাচঘরে কেউ যায়নি দিনের বেলাও ?

কে যাবে ওখান ? সাপেদের আড্ডা সেখানে। ধারেকাছে কেউ ঘেঁষতেই পারে না।

কেউ চেষ্টা করেছিল ?

হ্যাঁ। বিষেণদেওবাবু তাঁর দুজন শিকারীকে পাঠিয়েছিলেন। বন্দুক দিয়ে একদিন। একজনকে সাপে কামড়ে নীল করে দিয়েছিল। ভূতে অন্যজনের গলা কামড়ে মাংস খেয়ে গেছিল।

কতদিন আগে ?

তা দিন পনেরো হল।

তারপর কেউ যায়নি আর ?

কে যাবে ? কার এত হিম্মত ?

ভানুপ্রতাপ ?

ভানুপ্রতাপের হিম্মত আছে। ও যেতে চায় বলে, আমার বাবার ভূত আমি বুঝব ! কিন্তু বিষেণদেওবাবুই যেতে দেন না। ওর হাতে-পায়ে ধরে আটকান প্রত্যেকবার। ভানু ছাড়া যে ওঁর আর কেউই নেই। ঐ শিকারী দুজনের কপালে যা যা ঘটেছিল তা জেনেশুনেও তারপর ভানুপ্রতাপকে কি করে পাঠান উনি !

ঋজুদা বলল, বহুত্ মেহেরবানী। আমাদেরও প্রাণের ভয় আছে। তাছাড়া বেড়াতে এসে এসব ঝামেলাতে জড়াতে চাই না আমি। আমরা কালই শিকারের পর এখান থেকে চলেই যাব ভাবছি। এ ত' দেখছি খতরনাগ্ ব্যাপার-স্যাপার।

বহুত্। ঘাড় নীচু করে বলল ব্রিজনন্দন।

ঋজুদা হঠাৎ বলল, আপনার কোমরে গোঁজা ওটা কি ? পিস্তল না রিভলবার ?

ব্রিজনন্দন চমকে উঠে বাঁদিকের কোমরে হাত দিল।

আমার চোখে পড়েনি। কিছু বোঝাও যাচ্ছে না কেরোসিনের ঝাড়ের বাতিতে। গোলাপী টেরিলিনের পাঞ্জাবীর নীচে ধুতির সঙ্গে যে কিছু বাঁধা থাকতে পারে তা আমার একবারও মনে হয়নি।

ব্রিজনন্দন মুখ নীচু করে বলল, রিভলবার। জমিদারী দেখাশোনার কাজ করি। গায়ের জোরও কম খাটাতে হয় না। আমাদের দেঁহাতে এখনও জোর যার, মুলক্ তার। অনেক শত্রু আমার উজ্‌জানপুরে—তাই সবসময় সঙ্গে রাখি।

ঋজুদা বলল, ও।

তারপর বলল, তা এখানে ত' শত্রু নেই। আছে নাকি ?

—না, এখানে নেই। তবুও সবসময় গোঁজাই থাকে। আসলে, আদতও বৈঠ গায়া।

তারপরই বলল, হুজৌর। আপনারও ত' কোনো শত্রু নেই এখানে—কিন্তু আপনিও ত' সবসময় কোমরে পিস্তল বেঁধে রেখেছেন। কেন ?

ঋজুদা হাসল। বলল, অভ্যেস, ঐ আপনারই মত। আদত্ বৈঠ গায়া।

ঋজুদা আবার বলল, বহুত্ মেহেরবাণী। আমরা দরজা ভাল করে বন্ধ করে শোব। আর খুলব সেই সকালে—বেয়ারা চা নিয়ে এলে।

তারপর কি ভেবে ঋজুদা বলল, যা ভয় ধরিয়ে দিলেন আপনি—আমরা দুজনে আজ এই এক ঘরেই শোব। আপনি যদি আমার শামানগুলো কাউকে দিয়ে এ ঘরে আনিয়ে দেন।

ব্রিজনন্দন হাতের সোনার ঘড়িতে তাকিয়ে চিন্তিত হয়ে উঠল। বলল, ওয়াক্ত জ্যাদা নেহী হ্যায়।

বলেই, বলল, আমি তুরন্ত বন্দোবস্ত করছি। বলেই, তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে নীচে চলে গেল।

ঋজুদা কথা না বলে ইজীচেয়ারটাতে বসে পাইপ খেতে লাগল। একটু পরই দুজন বেয়ারা ঋজুদার মালপত্র ধরাধরি করে আমার ঘরে নিয়ে এল। ব্রিজনন্দন বারবার ঘড়ি দেখছিল। সব মাল এসে যেতেই ওরা তাড়াতাড়ি চলে গেল নীচে।

ওরা নীচে চলে যেতেই হঠাৎ যেন সমস্ত মালোয়াঁ-মহলে গা-ছমছম অন্ধকার নেমে এল। নীচের দেউড়ির পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজল। বাইরে যে কত জ্যোৎস্না তা সারা বাড়ির আলো এক এক করে নিভে যাওয়াতে প্রথম উপলব্ধি করলাম আমরা। ঋজুদা উঠে ঘরের বাতিগুলো নিভিয়ে দিল। তারপর ইজীচেয়ারটাকে তুলে যাতে শব্দ না হয় তেমন করে জানালার সামনে এনে পাতল। আমিও চেয়ারটাকে ঐভাবে নিয়ে এলাম।

অন্ধকার ঘরে ঋজুদার পাইপের লাল আগুনটা একবার জোর হচ্ছিল আর একবার নিভু নিভু হচ্ছিল—পাইপে টান দেওয়ার সঙ্গে সমতা রেখে। বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। সাদা মারবেলের চওড়া বারান্দাতে থামের ছায়াগুলো এসে পড়েছিল লম্বা হয়ে। এখন পুরো পরিবেশটাই ভুতুড়ে ভুতুড়ে লাগছে।

পাইপটা হাতে নিয়ে ঋজুদা বলল, এখানের ভূত পেত্নীরা ত' খুব ইন্টারেস্টিং। ব্রিজনন্দন যেভাবে ঘড়ি দেখছিল, তাতে মনে হল যে, তারা ঘড়ি দেখেই ঘোড়া চড়ে; ঘড়ি ধরে গান গায়।

আমার মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। বেড়াতে এসে কী ঝুটঝামেলাতে পড়লাম রে বাবা!

ঋজুদা বলল, রুদ্রদ্দুরবাবুর ব্যাপার আলাদা। একে অ্যালবিনো; তায় ভূত-পেত্নী। ফিরে গেলে ক্লাসের ছেলেগুলোর অবস্থা কাহিল হবে তোর গুল শুনতে শুনতে। ওরা যতই শুনবে, ততই অবিশ্বাস করবে। আর ওরা যত অবিশ্বাস করবে তুই ততই ওদের বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করবি। পুওর রুদ্রদ্দুরবাবু! ওয়াভারাবোদের হাত থেকে বেঁচে এসে শেষে কী না হাজারীবাগী ভূতের হাতে থাপ্পড় খেয়ে মরবি?

আঃ চুপ করো না। আমি বললাম, উত্তেজিত গলায়।

ঋজুদা বলল, খিলটা ভালো করে লাগিয়ে দিয়ে তুই খাটে শুয়ে পড় গিয়ে কোলবালিশ টেনে। দেখা বা শোনার মত কিছু থাকলে তোকে তুলে দেবো। আমি আজ এইখানেই রাত কাটাব। ইজিচেয়ারটা ভারী কমফর্টেবল্। পা-ও তুলে দেওয়া যায় দুই হাতলের নীচের বাড়তি হাতলে।

তারপর বলল, যাঃ। শুয়ে পড়।

আমি গিয়ে শুয়ে পড়লাম। বড় বড় পাল্লাওয়ালা শিকবিহীন খোলা জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে আকাশের এক কোণে মেঘ জমেছে আস্তে আস্তে। কিন্তু দু'দিন পর পর বৃষ্টি হওয়াতে চারদিকের জঙ্গল পাহাড় ঝকঝক্ করছে জ্যোৎস্নাতে। ঝির ঝির করে হাওয়া দিয়েছে। বনে-বনে, পাতায় পাতায় ঝরঝরানি আওয়াজ তুলে। চাঁদের আলোয় মাখামাখি হয়ে সেই হাওয়া ভেজা বনের মিশ্র গন্ধ বয়ে নিয়ে আসছে ঘরে। ব্রেইনফিভার পাখি ডাকছে থেকে থেকে। নাচঘরের কাছে ডিড্-ইউ-ডু-ইট ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে কাকে যেন কি শুধোচ্ছে। ভারী শান্ত সুন্দর স্নিগ্ধ প্রকৃতি এখানে। জানালার সামনে বসা পাইপমুখে ঋজুদার শিল্যুট বাইরের জ্যোৎস্না-মাখা আকাশের পটভূমিতে অনড় হয়ে রয়েছে।

অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি জানি না। ঘুমের

মধ্যেই স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। দূরে কে যেন ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে বনের মধ্যের পাথুরে পথ দিয়ে। টগবগ্ টগবগ্—টগাবগ্-টগাবগ্ ছন্দোবদ্ধ আওয়াজ যেন মাথার মধ্যে জোর হচ্ছে। আচমকা আমার ঘুম ভেঙে যেতেই দেখি দরজাটা খোলা, হাঁ-করে। ঘরের মেঝেতে চক্চক্ করছে চাঁদের আলো, আর বাইরে স্বপ্নের মধ্যে শোনা সেই শব্দ। ধড়মড় করে আমি উঠে বসলাম খাটে। তারপর ঋজুদাকে দেখতে না পেয়ে, খাট থেকে নেমে বারান্দায় এলাম। দেখি ঋজুদা বারান্দার রেলিঙে দু' হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। আর ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় একটা সাদা ঘোড়ায় চড়ে দূরে একটা অস্পষ্ট কালো মূর্তি দ্রুত চলে যাচ্ছে।

ঋজুদা খুব মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে আছে সেই সাদা রাতে সাদা ঘোড়ায় দ্রুত মিলিয়ে যাওয়া অস্পষ্ট কালো-সওয়ারের দিকে।

যতক্ষণ শব্দটা শোনা গেল ততক্ষণ আমরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম। ঘরে যখন এসে ঢুকেছি ঠিক তখনই তানপুরা আর সারেঙ্গীর আওয়াজ ভেসে এল নাচঘরের দিক থেকে। আর ঠিক তারপরেই ভেসে এল দারুণ মিষ্টি গলার আলাপ।

কয়েক সেকেন্ড কান খাড়া করে শুনেই ঋজুদা সুস্থ গলার বলল, আহা! কোন্ পেত্নী এমন গান গায় রে। জানতে পেলে, এই পেত্নীকেই বিয়ে করে ফেলতাম।

আমি কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম। ঋজুদা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, কথা বলিস না। আলাপটা শোন ভাল করে। আহা রে। যেন গহরজান বাঈজী গাইছে।

এমন রাত, এমন সুরেলা গান, এমন সারেঙ্গীর ছড়ের করুণ কান্না যে, আমার মত বেসুরো লোকের বুকের ভিতরটাও মুচড়ে মুচড়ে উঠতে লাগল। পেত্নীর কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে আমি ইজীচেয়ারে বসা ঋজুদার কাঁধ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ঐদিকে চেয়ে রইলাম।

সমস্ত মালোয়াঁ-মহল নিথর নীরব। ঐ দূরাগত গান জঙ্গল আর জ্যোৎস্না সাঁতরে এসে কোনো গভীর নদীর পরিষ্কার খরস্রোতা জলের মত এই প্রাসাদের আনাচ-কানাচ, জাফরি-ঘুলঘুলি সব কানায়-কানায় ভরে দিচ্ছে। অথচ এই মালোয়াঁ-মহলে একজনও প্রাণী জেগে আছে বলে মনে হচ্ছে না। জেগে থাকলেও কি তারা কেউই ভয়ে শব্দ করছে না? কে জানে?

গান ত' নয়, যেন করুণ মিনতি, যেন উথলে-ওঠা কান্না কারো।

ঋজুদা গম্ভীর গলায় বলল, কি রাগ বল্ ত'?

আমি বললাম, বেহাগ।

ঋজুদা মাথা নাড়ল দু'পাশে।

তাহলে? চন্দ্রকোষ?

আঃ। বিরক্ত হয়ে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল ঋজুদা। তারপর বলল, মালকোষ। তোর মায়ের গলায় "আনন্দধারা বহিছে ভুবনে" গানটা শুনিসনি? এই রাগের উপরই ত' ঐ গানটি বাঁধা। রবীন্দ্রনাথের ঐ একটিমাত্র গানই আছে মালকোষ রাগাশ্রিত। স্যরী। না আরও একটি গান আছে। চিরকুমার সভার গান। "স্বর্গে তোমায় নিয়ে যাবে উড়িয়ে"।

গানের রাগের কথা ভুলে গেলাম আমি। কিন্তু আমার রাগ আর ভয় দুইই একসঙ্গে এল। এই ভৌতিক রহস্যময় গানের মধ্যে, আমার মায়ের গানকে টেনে আনার কি মানে হয়?

গান চলতেই লাগল। ঋজুদা তন্ময় হয়ে বসে রইল। বলল, এখানে আসা আমার সার্থক। বুঝলি রুদ্র। বহুদিন এমন গান শুনিনি। আর এমন চমৎকার পরিবেশ।

আহাঃ।

আমি গিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম এসে গেছে আবার, প্রায় ঠিক সেই সময় ঘোড়ার খুরের শব্দ আবার ফিরে এল। কে এই ভৌতিক ঘোড়সওয়ার ? কোথায় এবং কেন এর রাতের সহল তা কে জানে ? শব্দটা জোর হতে হতে যে পথে এসেছিল সেই পথেই মিলিয়ে গেল। নাচঘরের কাছে গিয়েই হঠাৎ যেন থেমে গেল।

গান কিছু তখনও চলছিল। আলাপ শেষ হয়ে বিস্তারও শেষ হয়ে তখন তান তার গন্তব্যের দিকে বয়ে চলেছিল দূর জঙ্গলের বহতা ঝর্নার জলের কুলকুলানি জলতরঙ্গর মত ; রাতের হাওয়ায় বনের বুকের মধ্যে থেকে ওঠা মৃদু মর্মরধ্বনির সঙ্গে।

॥ ৬ ॥

ভোরবেলা চা দিয়ে আমাদের ঘুম ভাঙাবার কথা ছিল। ভোর সাড়ে-চারটের সময় বেরিয়ে পড়ার কথা অ্যালবিনোর জন্যে ছুলোয়া শিকারে।

কিন্তু যখন আমার ঘুম ভাঙল তখন অনেক বেলা। চোখ খুলেই দেখলাম, ঋজুদা ইজীচেয়ারটাতে বসে, ডাইরীতে কী সব লিখছে। পায়জামা পাঞ্জাবীই চড়ানো আছে। তৈরি হয়নি বেরুবার জন্যে।

ধড়মড় করে উঠে বসে বললাম, কি হল ? যাবে না ?

যাব মানে ? যাঁরা নিয়ে যাবেন তাঁদেরই পাত্তা নেই।

পাত্তা নেই মানে ?

বোধহয় ভূত-পেত্নীর খপ্পরে টপ্পরে পড়েছেন কেউ।

এমন সময় টি-কোজী মোড়া কেট্‌লী আর কুচো নিম্‌কি নিয়ে বেয়ারা ঘরে এল।

সেলাম করে বলল, ছোটা হুজৌরকা তবিয়ৎ গড়বড়া গ্যয়া। উসী লিয়ে আজ ছুলোয়া নেহী হোগা।

বলতে বলতেই, ব্রিজনন্দন এসে হাজির। মানুষটার সবসময়ই ঐ একই পোশাক। ধুতি আর গোলাপী টেরিলিনের শার্ট। ঘুমোবার সময়ও পরে কি-না কে জানে ?

আইয়ে, আইয়ে ; পাধারীয়ে। ঋজুদা আপ্যায়ন করে বলল। তারপর বলল, ভালোই হয়েছে আজ ছুলোয়া না করে।

রাতে আমারও তবিয়ৎ গড়বড় করেছিল। ঘুম থেকেও আমরা ত' এইই উঠলাম।

ঋজুদা শুধোলো, বিষেণদেওবাবু কেমন আছেন ?

এখন ভালোই আছেন। মনে হয়, এই গরমের পর হঠাৎ বৃষ্টিতে ঠাণ্ডা লেগে গেছে। শরীর রসস্থ। জ্বর-জ্বর ভাব। ওষুধপত্রও বেশি খেয়েছেন হয়ত।

বিষেণদেওবাবু উঠেছেন ? ঋজুদা শুধোলো।

উঠেছেন। বড় হুজৌর বোধহয় পুজো করছেন। ঘর এখনও বন্ধ।

আমি অধৈর্য গলায় কথার মধ্যে কথা বলে উঠলাম, অ্যালবিনো বাঘটা এই জঙ্গল ছেড়ে চলে যাবে না ত' !

ব্রিজনন্দন আশ্বাস দিয়ে বলল, না না, আপনাদের বাঘ আর যাবে কোথায় ? হুজৌরদেরই জঙ্গল, হুজৌরদেরই বাঘ। বাঁধাই আছে বলতে গেলে। যাবেন, আর ধড়কে দেবেন।

তারপর একটু চুপ করে থেকে আমার অস্তিত্ব বেমালুম ভুলে গিয়ে ঋজুদার দিকে চেয়ে বলল, আপনার কথা বিষেণদেওবাবুর কাছে অনেক শুনেছি হুজৌর। আপনি ত'

আমাদের উজ্জানপুরের হুজৌরকেও চিনতেন ?

আমি কথাটা শুনে অবাক হলাম।

ঋজুদার দিকে তাকালাম।

ঋজুদা বলল, হ্যাঁ। চিনতাম বৈকি ! আমরা ওকে 'স্যান্ডি' বলে ডাকতাম। স্কুলে পড়তাম একসঙ্গে। মুলিমালোয়ার রাজাসাহেবের মেয়ে শুভাবাঈর সঙ্গে বিয়ের সময়ও কোলকাতার দাওয়াতে গেছিলাম। তবে মুলিমালোয়া আর উজ্জানপুরে যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

ব্রিজনন্দন বললেন তাহলে ত' ভানুপ্রতাপ আপনার নিজের ছেলেরই মত। একটু দেখবেন হুজৌর !

ব্রিজনন্দনের চোখে-মুখে ভানুপ্রতাপের জন্যে বিশেষ এক দরদ ফুটে উঠল যেন।

মনে হল, ব্রিজনন্দন কি যেন বলতে চায়, যেন ভানুপ্রতাপের খুব বিপদ এখানে, এমন কিছু বলতে চায়, অথচ বলতে পারছে না মুখ ফুটে। কাল থেকে ও যতবার উপরে এসেছে, ততবারই আমার এ-কথা মনে হয়েছে।

ঋজুদা বলল, ও ত' যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে। ও নিজেই নিজেকে দেখতে পারে। তাছাড়া, আজকালকার ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেলে কেউ ওদের উপর গার্জেনী করুক তা ওরা পছন্দ করে না। তারপর আমার দিকে দেখিয়ে বলল, আমার সাথীটিকে দেখে বুঝছেন না ?

এইই ত' হচ্ছে আসল কথা। ব্রিজনন্দন দু' হাতের পাতা তাঁর পেটের দু' পাশে উলটে দিয়েই বললেন। ঈ-জামানাই দুসরা হ্যায়।

ব্রিজনন্দন চলে গেলে, ঋজুদা বলল, কেমন ঘুম হল রাতে রুরুদরবাবু ?

ভালো।

বলেই, বললাম, টানাপাখার পাখাওয়ালা কোথায় বসে পাখা টানে বলো ত' ? বারান্দায় ত' নেই ওরা।

পাখার দড়িটা কোথা থেকে আসছে চোখ খুলে দ্যাখো রুরুদরবাবু।

ঋজুদা বলল।

তাইই ত' ! পাটার দু'পাশ থেকে দুটো দড়ি মধ্যিখানে এসে জোট-বেঁধে দেওয়ালের ফুটো দিয়ে চলে গেছে যেদিকে, সেদিকে বারান্দা নেই।

ঋজুদা বলল, বাইরের বারান্দায় বসলে বেচারীরা একটু হাওয়া পেত নিজেরা। কিন্তু তেমন ত' নিয়ম নয়। ঘরের লোকের প্রাইভেসী ডিস্টার্বড হত তাহলে। ওরা হয়ত চতুর্দিকে বন্ধ কোনো ঘরে বসে গরমে ঘেমে-নেয়ে সারারাত পাখা-টেনে ঘুম পাড়াচ্ছে তোকে।

আমি বললাম, না না, ভিতরের দিকে যে বারান্দা আছে, নিশ্চয়ই সেই বারান্দায় বসেই পাখা টানছে ওরা।

সম্ভাবনা কম। অবশ্য, হতেও পারে। এ বাড়িতে মেয়েই নেই। তাই আপাতত অন্দরমহলের বালাই নেই।

আমি বললাম, তুমি ভানুপ্রতাপের বাবাকে চিনতে নাকি ? বলোনি ত' ?

আরে সে কি আজকের কথা ! খুব ভাল স্পোর্টসম্যান ছিল স্যান্ডি। যে-কোনো খেলাই ভালো খেলত। চুনী গোস্বামীর মত। উজ্জানপুর থেকে ফারস্ট-ক্লাস ল্যাংড়া আম এনে স্কুলের ফাদারদের দিত ঝুড়ি ঝুড়ি—তাও মনে আছে। ছুটির আগে বাড়ি

যাওয়ার সময় হস্টেলের বেয়ারাদের প্রত্যেককে তখনকার দিনে পঞ্চাশ টাকা করে বকশিশ দিত। সেলুন রিজার্ভ করে যাওয়া-আসা করত। ফুটানী করে নিয়েছে একসময় ওরা।

আমি বললাম, এখনও করছে অন্যরা। তখন ওরা ছিলেন মহারাজা আর এখন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আর পোলিটিক্যাল লিডাররা মহারাজা। ফুটানী করার মানুষ ঠিকই আছে। সেই মানুষগুলোর চেহারা আর পোশাকই বদলেছে শুধু।

তারপর বললাম, কি, ঠিক করলে কি ?

কিসের কি ? বলেই, ধমক লাগালো আমাকে। তাড়াতাড়ি খা। নিমকিগুলো ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। ফারস্ট-ক্লাস খেতে কিন্তু। দারুণ খাস্তা।

ভূত-পেত্নীর ব্যাপারটা একটু ইনভেস্টিগেট করবে না ?

হুঁ। ঋজুদা বলল। অন্যমনস্কভাবে।

তারপর বড় এক ঢোক চা খেয়ে বিড়বিড় করে আবৃত্তি করল :

"মিঞার মুখোশ বিবির মুখোশ
ছেলের মুখোশ, মুখোশ চাই ?
মুখোশওয়ালা যাচ্ছে হেঁকে
লেঙ্গে মুখোশ ? হাতেম ভাই ?"

—এ আবার কি ? আমি বললাম।

—লালা মিঞার শায়েরী।

আমি আর বেশী ঘাঁটালাম না ঋজুদাকে। আজ সকাল থেকেই কেমন হেঁয়ালী হেঁয়ালী মুড়।

চা খাওয়া শেষ করে বলল, আমার বাক্সটা এনেছিস ? গদাধর দিয়ে দিয়েছে ত ?

—না ত' ?

সত্যি। তুইও সেরকম ! বিরক্ত হয়ে ঋজুদা বলল। গদাধরের যদি অতই দায়িত্বজ্ঞান আর বুদ্ধি থাকবে, তাহলে ও আমার মত লোকের কাছে সারাজীবন নকরী করে মরবে কেন। তুই যে কী না !

আমি বললাম, দাঁড়াও দাঁড়াও—হয়ত গাড়ির ডিকিতেই পড়ে আছে। স্টেপনীর পাশেও থাকতে পারে। আমি এখুনি দেখে আসছি।

ঋজুদা বলল, একদম না। ইডিয়ট্।

আফ্রিকা থেকে ফেরার পর ঋজুদা বড্ড খিটখিটে হয়ে গেছে। আমি যে ইডিয়ট এ-কথাটা যেন এতদিন পরেই আবিষ্কার করল। রাগ হয়ে যায় মাঝে মাঝে।

একটু চুপ করে থেকেই বলল, আমরা ব্রেকফাস্ট খেয়েই হাজারীবাগ যাব। যাওয়ার সময় পথে দেখলেই হবে গাড়ি থামিয়ে, বাক্সটা আছে কী নেই। বুঝলি।

হাজারীবাগ কেন ?

হাজারীবাগ বলে বেরোব। তারপর নাও যেতে পারি। কোলকাতাও চলে যেতে পারি। যেমন ইচ্ছা করবে।

বাঃ ! অ্যাল্‌বিনো ?

অ্যাল্‌বিনোর জন্যে আবার ফিরে আসা যাবে। নিজেদের হাতিয়ার-টাতিয়ার নিয়ে। পরের তা সে যত দামীই আর যত ভালোই হোক না কেন, আমি ভরসা পাই না।

অবাক হলাম। বললাম, সত্যিই চলে যাবে ?

ঋজুদা বলল, কথা না বলে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে।

সেদিন ব্রেকফাস্টের সময় ভানুপ্রতাপ সামান্যই খেলেন। চোখ দুটো লাল দেখাচ্ছিল। খুব সর্দি হয়েছে। বিষেণদেওবাবু নামলেনই না নীচে তখনও। কী এত পুজো করছেন উনিই জানেন।

ঋজুদা ভানুপ্রতাপকে বলল, নাস্তা করে আমরা একটু লুলিটাওয়া অবধি ঘুরে আসি। আপনাদের রুরুদ্দরবাবু ত' অ্যাল্‌বিনো না মারতে পেরে আমার উপর খাপ্পা হয়ে রয়েছে। ভীষণ। ছুলোয়াটা পিছিয়ে গেল।

ভানুপ্রতাপ হাসলেন।

এমন সময় বিষেণদেওবাবু ঘরে ঢুকে হাসতে হাসতে বললেন, বাঘ ত' তোমারই আছে। আমার যে শিকারীরা তোমাদের কালিতিতির বটের মেরে খাওয়াচ্ছে, তারাও বাঘটাকে দেখেছে। সব ইন্তেজামও করছে তারাই। ওদের ইন্তেজামের কোনো ত্রুটি থাকে না। বাঘ মারিয়েই ওরা ছাড়বে তোমাকে। ঋজুবাবু যদি নাওও মারেন !

ভানুপ্রতাপ বললেন, শরীরটাও নোটিশ না দিয়ে হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। আজ হলো না ত' কি ? কাল-পরশু ছুলোয়া নিশ্চয়ই হবে।

ঋজুদা বলল, আমরা তাহলে একটু ঘুরে-টুরে আসি।

বিষেণদেওবাবু বললেন, গাড়িতে যাচ্ছেন, সঙ্গে ঠাণ্ডা জল আর কিছু খাবার দিয়ে দিই ?

ফ্লাস্কে করে চা নেবেন না কি ?

চা হলে ত' ফারস্ট ক্লাস হয়। ঋজুদা বলল।

চায়ের সঙ্গে কিছু বরফি আর শেওইও নিয়ে যান। জঙ্গলের পথ। গাড়ি খারাপ হল, হঠাৎ টায়ার পাংচার হল : কে বলতে পারে।

আমরা যখন ফটকের বাইরে এসে পড়লাম তখন আমি বললাম, প্রথমে হাজারীবাগ বলে, পরে আবার টুটিলাওয়া বললে যে।

প্রথমে লুলিটাওয়া পড়বে তারপর টুটিলাওয়া, তার অনেক পরে হাজারীবাগ। আমাদের কাজ টুটিলাওয়াতে হয়ে গেলে আর হাজারীবাগ যেতে হবে না।

কি কাজ ?

ঋজুদা বলল, শোন রুদ্র। তোকে একবার কোলকাতায় যেতে হবে। কতগুলো কাজ দিয়ে পাঠাব তোকে। কাজগুলো যে কি, তা এখনও আমি নিজেও জানি না। কিন্তু মনে হচ্ছে, তোকে যেতেই হবে।

তুমি একা থাকবে ? এখানে ?

দু'দিন। মাত্র দু'দিন। তারপর ত' তুইও চলে আসবি। তুই এলে, তারপর আরও দু-একদিন থেকে ; যদি এখানে থাকার মত অবস্থা থাকে ; দুজনেই ফিরে যাব।

লুলিটাওয়া হয়ে টুটিলাওয়া পৌঁছতে পৌঁছতে আমাদের পঁয়তাল্লিশ মিনিট মত লাগল। পথের প্রতিটি মোড়, পথের পাশের প্রতিটি ল্যান্ডমার্ক মনে হল, ঋজুদার মুখস্থ। এদিক-ওদিকে নানা দেখার জিনিস দেখাতে দেখাতে চলেছিল আমাকে। আসবার সময় এ পথে রাতের অন্ধকারে এসেছিলাম। রাতে আর দিনে জঙ্গলের রূপের যে কত তফাত ; তা বলার নয়। রাতের অন্ধকারে ভয়, কৌতূহল আর রহস্য যেন মাখামাখি হয়ে থাকে। আর দিনের আলোয় সব স্পষ্ট স্বচ্ছ।

টুটিলাওয়ার জমিদারবাড়িটা দেখে মনে হয় একটা মসজিদ। মসজিদও আছে পাশে। এখনকার জমিদার ইজাহারুল হক্ খুব শৌখিন লোক। ইনিই এস-পি সাহেবের ছেলের সঙ্গে সিতাগড়ার বড় বাঘটা মারার সময় ছিলেন।

সেখানে পৌঁছে দেখা গেল ইজাহারুল নেই। হাজারীবাগে গেছেন। হাজারীবাগেই থাকেন উনি।

ঋজুদা ইজাহারুল সাহেবের ম্যানেজার হাজী সাহেবকে জিজ্ঞেস করল, ওঁদের কোনো লোক শিগগিরি কোলকাতায় যাবে কি না?

—হাজী সাহেব বললেন, আমি নিজেই যাব কালকে—সারিয়া হয়ে।

—ফারস্ট ক্লাস্। গিয়েই এই চিঠিটা যদি পৌঁছে দেন হাজীসাহেব।

আমি ত' কোলকাতা চিনি না ভাল।

হাজীসাহেব বললেন।

আপনার চিনতে হবে না। খামের উপর ফোন নম্বর দিলাম। ফোন করলেই আমার লোক এসে চিঠিটা নিয়ে যাবে। খুব জরুরী চিঠি।

ব্যসস্, ব্যসস্, তাহলে ত' কোনো অসুবিধাই নেই। জরুর এ চিঠি পৌঁছে যাবে। কিন্তু মিঞাসাহেব নেই বলে আপনারা তসরিফ রাখবেন না একটু, এ কি করে হয়? নামুন নামুন। কোথা থেকে আসছেন? কবে এসেছেন?

আমরা নেমে ভিতরের পাথরের তৈরি ঠাণ্ডা ঘরে বসলাম। হাকিমী দাওয়া মেলানো গোলাপী-রঙা শরবত আর ফিরনী এলো আমাদের জন্যে।

আপত্তি করতেই হাজীসাহেব জিভ কেটে বললেন, তওবা, তওবা, গরীবের নোক্‌রী খেয়ে হুজৌরের লাভ? মিঞাসাহেব এসে শুনলে আমাকে কোতলও করতে পারেন।

ঋজুদা হাসল। বলল, এসেছি ত' ডালটনগঞ্জে। এদিকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে গেলাম আমার এই চেলাকে। ইমতেহান পাশ করেছে—পঁড়ে-লিখেমে বহুত্ তেজ।

আমি ফিরনী মুখেই হেসে ফেললাম। আমার পড়াশোনায় তেজ-এর কথা শুনে। এমন গ্যাস্ দেয় না।

হাজীসাহেব বুলেন, ঘর খুলে দি। স্নানের বন্দোবস্ত করি? খস্‌স ইত্তর দিয়ে চান করে আরাম করুন, তারপর ভালো করে বিরিয়ানী বানিয়ে দিচ্ছি। বিরিয়ানী এখনও আগের মতই ভালোবাসেন ত'?

ঋজুদা বলল, হাজীসাহেব, যে খাসীর বিরিয়ানী ভালো না বাসে, সে নিজেই নির্ঘাৎ খাসী। এমন উমদা খনা খুদার বেহেতরীন্ দুনিয়ায় আর বেশী কি আছে?

হাজীসাহেব দাড়ি-কচ্‌লে হেসে উঠলেন।

এ-কথা সে-কথার পর ঋজুদা বলল, পথে মুলিমালোয়ার মালোয়ামহল দেখলাম। ওঁদের একসময় চিনতাম ত' আমি ভালো করেই। ওঁদের খাল্-খরিয়াত্ সব ভাল?

হাজীসাহেব দু' বার দাড়িতে হাত চালিয়ে কাছা ঠিক করার মত মসৃণ করে নিয়েই বললেন, কা কহে সাহাব—পইসা বড়া গন্ধা চিজ্। পইসা আদ্‌মীকো জানোয়ার বনা দেতা। বিলকুল জানোয়ার।

ঋজুদা চোখ বড় বড় করে বলল, কি হল? ব্যাপার কি?

দিদিজীর স্বামী ত' ঘোড়া থেকে পড়ে মারা গেলেন। বড়ী তাজ্জব কী বাত্। ঘোড়াকে এসে সাপে কামড়াল। কি সাপ কেউ জানে না, কিন্তু অত বড় ওয়েলার ঘোড়া সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো। পাথরে চোট লাগল মাথাতে। সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ।

দিদিজীও হঠাৎ একদিনের অসুখে মারা গেলেন। এখন রয়েছে শুধু ভানুপ্রতাপ। কানাঘুষোয় শুনি বিষেণদেওবাবু এখন তাঁকেও মেরে সব কিছু নিজে হাত করার চেষ্টা

করছেন। লোকে বলে। শোনা কথা। হয়ত বাজে কথা। পরের কথায় কান দিতেও ইচ্ছে করে না।

তারপর বললেন, আমার কাছে এসব শুনেছেন এ যেন কাউকে বলবেন না।

ঋজুদা শরবতের গ্লাস নামিয়ে রেখে বলল, হুম্-ম্-ম্-ম। সেইজন্যেই বাইরে থেকে কেমন ছুতুড়ে-ছুতুড়ে লাগছিল বাড়িটাকে। যেন জঙ্গলের জিন-পরীদের আড্ডা, অথচ জানে.....

জিন-পরীর কথাও শুনি। লোকে বলে, নাচ-ঘরে নাকি, রাতের বেলা নানারকম আওয়াজ-টাওয়াজ শোনা যাচ্ছে কিছুদিন হল।

হ্যাঁ? তাই নাকি? ঋজুদা বলল। যেন অবাক হয়ে।

তারপর বলল, ওঁরা আছেন ত' ওখানে? বিষেণদেওবাবু আর ভানুপ্রতাপ?

ঝুমরি-তিলাইয়াতে যাওয়া-আসা করতে হয় ওঁদের প্রায়ই, কিন্তু যখন থাকেনও, তখনও মনে হয়, ভূতেরই বাড়ি। তারপর বললেন, বোস্ সাহাব, যেখানে ইমানদারী নেই, দিল নেই, খুশী নেই, পেয়ার নেই, সেখানে টাকা ভূত ছাড়া আর কি? মাইকার বিজনেস্ করে এঁরা ত' বোধহয় শ মাইলের মধ্যে এখন সবচেয়ে বড়লোক। কিন্তু লাভ কি? টাকা কি দিল ওঁদের?

একটু থেমে আবার দাড়ি-কচ্‌লে বললেন, হুজৌর। টাকা রোজগার করা সহজ, বড়লোক হওয়াও খুবই সহজ; কিন্তু টাকাওয়ালা হওয়ার পরও মানুষ থাকা বড়ই কঠিন। যাদের অনেক টাকা, তাদের মধ্যে বেশীই বদ্‌বু জানোয়ারের মত হয়ে যায়। টাকা ত' কাগজই সাহাব। টাকাকে কাজের মত কাজে লাগাতে ক'জন জানে?

ঠিক বলেছেন হাজীসাহব। একদ্দম সাহী বাত্। এবার আমরা উঠি। বহুত্ মেহেরবানী। আপনি ইজাহারকে বলবেন, আমার কথা।

কালই ত' আমার সঙ্গে দেখা হবে হাজারীবাগে। নিশ্চয়ই বলব, আপনার কথা। হাজীসাহেব বললেন। হাজারীবাগে ওঁর সঙ্গে দেখা করে যাবেন না?

নাঃ। এবারে বোধহয় হবে না। ঋজুদা বলল।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে আমরা মুলিমালোয়ার দিকে চললাম।

ঋজুদা বলল, হাজীসাহেব যখন বললেন পরের কথায় কান দিতেও ইচ্ছে করে না, তখন হাজীসাহেবের কান দুটো কেমন লম্বা হয়ে গেল, দেখেছিলি?

আমি হাসলাম।

ঋজুদা বলল, বিরিয়ানীর চেয়েও মুখরোচক আর কি জিনিস আছে বল্ ত'?

কি? আমি শুধোলাম মুখ ঘুরিয়ে।

ঋজুদা বলল, পরনিন্দা আর পরচর্চা। বিনি পয়সার এমন খানা আর হয় না।

টুটিলাওয়া থেকে বেরিয়ে লুলিটাওয়া ছাড়িয়ে এসে যখন আমরা প্রায় মুলিমালোয়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি তখন ঋজুদা পথের ডানদিকে হঠাৎ একটা একেবারে অব্যবহৃত ঝরা-পাতা ভরা পথে গাড়িটাকে ঢুকিয়ে দিয়ে স্পীড কমিয়ে আস্তে আস্তে চলতে লাগল। মচ্‌মচ্ করে খয়েরী পাতা গুঁড়োতে লাগল চাকার নীচে পাঁপড় ভাজার মতো।

বেশ কিছুদূর গিয়ে, গাড়ি থামিয়ে বলল, ফ্লাস্ক থেকে এক কাপ চা ঢাল ত' রুদ্র। পাইপটা ধরিয়ে বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দিয়ে নিই।

আমি চা ঢালছি এমন সময় ঋজুদা হঠাৎ বলল, তোর মায়ের মরণাপন্ন অসুখ রুদ্র। তোকে কোলকাতায় যেতে হবে, আর.....

কথাটা শুনেই আমার হাত কেঁপে চা চল্‌কে পড়ে গেল গাড়ির সীটে।

তুই একটা যা-তা। ঋজুদা বলল।

বললাম, বললে আমার মা মরণাপন্ন আর.....

ঋজুদা বলল, সেনটেন্সটা কমপ্লিট করতে দিবি ত'। দিলি ত' সীটটাতে দাগ ধরিয়ে, বলেই হলুদ ন্যাকড়া বের করে মুছতে লাগল।

তারপর বলল, পরশু-তরশুই কোলকাতা থেকে একটা আর্জেন্ট টেলিগ্রাম আসবে তোর নামে—মাদার সিরিয়াসলী ইল্। কাম ইমিডিয়েটলী।

কে করবে?

ভট্‌কাই। ভট্‌কাইকে ব্যাপারটা সিক্রেট রাখতে বলেছি। হাজীসাহেবের সঙ্গে ওর কাছেই চিঠি পাঠালাম। টেলিগ্রামটা পেয়ে অন্তত একটু কাঁদো কাঁদো ভাব করিস—সত্যি হলে ত' আর করবি না; জানাই কথা। টেলিগ্রাম পাবার পর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাবি। কোলকাতা অবধি কিন্তু গাড়ি নিয়ে যাবি না। ধানবাদে গাড়ি রেখে দিবি—ধানবাদ টেলিফোন এক্সচেঞ্জের ঠিক উলটো দিকে নারাং আয়রন এন্ড স্টীল কোম্পানী আছে। সেখানে। চিঠি দিয়ে দেব আমি। রাতটা ওদের কাছে থেকে, ভোরের ট্রেন ধরে কোলকাতা। টেলিগ্রাম যদি সকালে এসে পৌঁছয় তবে ত বিকেল বিকেলই ধানবাদ পৌঁছে সেই রাতেই কোলকাতা পৌঁছে যাবি।

তারপর?

আমি একসাইটেড্ হয়ে বললাম, ঋজুদাকে চা এগিয়ে দিতে দিতে।

তারপর তোদের বাড়িতে না গিয়ে আমার বাড়িতে উঠবি সটান। ভট্‌কাইকে ফোন করে জানবি তোর মা-বাবা কেমন আছে। তোর সঙ্গেই তিনটি জায়গায় তিনটি চিঠি দেব। সেই তিন জায়গাতেই নিজে গিয়ে দেখা করবি। ওঁদের সঙ্গে নিজে কথা বলবি। যা জানার, জেনে আসবি। তোর পাশ করার কারণে তোকে যে প্রেজেন্টটা দেব বলেছিলাম, সেটাও এতদিনে এসে যাওয়ার কথা। এসে গেলে, সেটাও সঙ্গে করে নিয়ে আসবি। হয়ত, এখানে কাজে লাগতে পারে।

—কোথা থেকে? আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম। কি প্রেজেন্ট?

—ধীরে, রুরুন্দরবাবু, ধীরে। সময়ে, সবই জানবে। এখন চল্, চা খেয়ে নিয়ে আমরা নাচঘরে যাব।

নাচঘর? নাচঘর এখানে কোথায়?

ভূতের ভয়ে আমার গলা কেঁপে গেল একটু।

এই রাস্তাই নাচঘরের সামনে নিয়ে গেছে। এ রাস্তা এখন আর কেউই ব্যবহার করে না। তবে গাড়ি কতদূর যাবে তা বলা যায় না। পুরো রাস্তা গাড়িতে যাওয়াও হয়ত ঠিক হবে না। শেষের আধ মাইল হেঁটন মারব। আমার লাঠিটাও বের করিস পেছন থেকে। আর এই বেলাই নিরিবিলিতে বাক্সটা দেখে নে বরং।

আমি নেমে, বুট খুলে ঋজুদার লাঠি আর বাক্স বের করলাম। বাক্সটা ঠিকই আছে। আফ্রিকা থেকে এসে একটা নতুন বাক্স; নতুন করে গুছিয়েছি আমরা। এখন থেকে যেখানেই যাব; বাক্সটা সঙ্গে যাবে। ঋজুদার স্ট্যান্ডিং-অর্ডার।

আমাদের চা খাওয়া হয়ে গেলে গাড়ি স্টার্ট করল ঋজুদা। আস্তে আস্তে চলতে লাগল গাড়ি। দু'ধারে নানারকমের গাছ ঝুঁকে পড়েছে রাস্তায়। নানারঙা শুকনো পাতায়—হলুদ, লাল, হলুদ-লাল, খয়েরী, সবজে-হলদে, সবজে এবং কালো পাতায় পথ

ছেয়ে রয়েছে। কিছু পাতা পচেও গেছে। খুব আস্তে চলছে গাড়ি পাতার মোটা নরম গালচের উপর দিয়ে। সূর্যের আলো ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে সামান্যই আসছে সেখানে। বাঁ দিকের জঙ্গল থেকে একটা কাঠঠোকরা সমানে কাঠ ঠুকে চলেছে আর ডানদিক থেকে একজোড়া হুপী। হুপীর ডাক, ঘন জঙ্গলের মধ্যে শুনলে ভারী গা-ছমছম করে।

কেন জানি না, এরকম পথে যেতে আমার খুব ভালো লাগে। যে পথে কেউ যায় না, যে পথে আমার আগে আর কারও পায়ের চিহ্ন পড়েনি, সেই পথে। ঋজুদা আমার মুখে এই কথা শুনে একদিন বলেছিল: জীবনের পথ সম্বন্ধেও এই কথা সবসময় মনে রাখিস রুদ্র। যে পথে অনেকে গেছে, সবাই যায়; সে পথে যাস না কখনও। নিজের পায়ের রেখায় নতুন পথ কেটে চলিস।

এত বছর ঋজুদার সঙ্গে থেকে থেকে জেনেছি যে, এই মানুষটার মধ্যে অনেকগুলো বিভিন্নমুখী মানুষ বাস করে। কোন্ মুহূর্তে যে কোন্ মানুষটা বাইরে বেরিয়ে এসে দেখা দেবে, তা আগের মুহূর্তেও বুঝতে পারি না।

প্রায় মিনিট পনেরো চলার পর হঠাৎ গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ল।

ঋজুদা বলল, সামনে পথের উপরে ওগুলো কি দ্যাখ্ ত'। ঘোড়ার ময়লা না?

আমি নেমে গিয়ে ভালো করে দেখলাম। বললাম, হ্যাঁ।

খুরের দাগ নেই?

দেখা যাচ্ছে না। বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে নিশ্চয়ই। ঝরা-পাতাতেও ঢেকে গেছে। এঞ্জিনটার মৃদু ঝিক্-ঝিক্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আমি মাটিতে নেমে, এদিক ওদিক দেখছি, এমন সময় দূরে একটা শীস শুনলাম। সংক্ষিপ্ত, তীক্ষ্ণ; হঠাৎ।

মানুষের শীস কি না বোঝবার চেষ্টা করছি, ঠিক সেই সময়ই পথের সামনের ঝরা পাতার উপর দিয়ে কি যেন কী একটা জিনিস বিদ্যুৎগতিতে আমাদের দিকে দৌড়ে আসতে লাগল। জিনিসটার গায়ের রঙ জঙ্গলের মতই জলপাই-সবুজ। তাকে ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না, শুকনো পাতায় হঠাৎ ওঠা ঝড়ের মত সড়সড় শব্দ শোনা যাচ্ছিল শুধু।

কি ব্যাপার, ভালো করে বোঝবার আগেই ঋজুদা চেঁচিয়ে উঠল, দৌড়ে গাড়িতে, রুদ্র! দৌড়ে।

এক দৌড়ে গাড়িতে উঠেই আমি দরজা বন্ধ করলাম।

ঋজুদা নিজের দিকের কাঁচ ওঠাতে ওঠাতে উত্তেজিত গলায় আমাকে বলল, কাঁচ, কাঁচ।

আমিও যত তাড়াতাড়ি পারি আমার দিকের কাঁচ তুলে দিলাম।

ততক্ষণে জিনিসটা এসে পড়েছে একেবারে সামনে—বিদ্যুতের চেয়েও বুঝি তাড়াতাড়ি। অতবড় সাপ যে হয় তা কখনও জানতাম না। সে লম্বায় বোধহয় প্রায় বারো ফিট হবে। গাড়ির বাম্পারের সামনে থেকে লাফিয়ে সোজা এক মানুষ সমান দাঁড়িয়ে উঠেই প্রকাণ্ড চওড়া ফণা আর প্রায় এক হাত লম্বা চেরা জিভ বের করে হিস্‌স্-হিস্‌স্ শব্দ করে বনেটের উপর আছড়ে পড়ে কাঁচের উপর এমন এক ছোবল মারল যে, একটু হলে কাঁচটা ভেঙে যেত।

ঋজুদা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাক্ গীয়ার দিল। বুঝলাম ঋজুদা গাড়ি ব্যাক্ করে নিয়ে সাপটাকে গাড়ি চাপা দিয়ে মারার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমার মনে হল, সাপটা এতই বড় যে, ইচ্ছে

করলে এতটুকু ছোট ফিয়াট গাড়িকে উলটেও দিতে পারে।

সাপটা গাড়ির বনেটের উপর উঠে এসেছিল, তবুও তার শরীরের পেছনের অংশটা গাড়ির সামনের অনেকখানি মাটি জুড়ে ছিল। গাড়িটা একটু পেছিয়েছে—সাপটা বনেট থেকে পিছনে নীচে নেমে গেছে, ঠিক তক্ষুনি পিছনের দরজার কাঁচের সামান্য ফাঁক দিয়েই আবার ঐ রকম জোরে শীসের আওয়াজ শুনলাম। এবং সেই শীস শোনার মুহূর্তের মধ্যে সাপটা নিজেকে কুঁকড়ে অদ্ভুতভাবে গুটিয়ে নিয়ে উলটে গিয়েই যেমন বিদ্যুৎ বেগে এসেছিল তেমন বিদ্যুৎ বেগেই চলে গেল। যখন উলটালো তখন তার পেটের সাদা-কালো দাগগুলো পরিষ্কার দেখা গেলো। এত জোরে গেলো যে, তার চলার পথের দু'পাশে শুকনো পাতা উড়তে লাগল।

আমরা দুজনে স্তব্ধ হয়ে সেদিকে চেয়ে রইলাম।

সাপটা দৃষ্টির বাইরে যেতেই ঋজুদা গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, হুম্‌ম্‌.....

আমি অধৈর্য গলায় বললাম, কি হল ? কিছুই বলছো না, খালি হুম্‌-হাম্‌ করছ। এক্ষুনি ত' "মাদার সিরিয়াসলি ইল্" টেলিগ্রাম আসার বদলে "সান বিটন বাই স্নেক—এক্সপায়ার্ড—" বলে টেলিগ্রাম পাঠাতে হত তোমার !

ঋজুদা বলল, হুম্‌ম্‌, ভেরী ইন্টারেস্টিং।

আমি এবার রেগে গেলাম। বললাম, ইন্টারেস্টিং ? অতবড় সাপ চিড়িয়াখানাতেও দেখিনি—বাপ্‌রে বাপ্‌ ব্যালিস্টিক্ মিসিল্ এর চেয়েও জোরে চলে এল। এখনও আমার বুক ধুক্‌পুক্ করছে।

ঋজুদা অন্যমনস্ক গলায় বলল, ক্ষীরের বরফি খা, জল খা ; চুপ কর। ভাবতে দে।

গাড়ি বড় রাস্তাতে পড়তেই ঋজুদা গাড়ি থামিয়ে দিয়ে বলল, রুদ্র তুই চালা গাড়ি। আমি পাশে বসব।

ড্রাইভিং সীট থেকে নেমে এসে, পাশের দরজা খুলে বসল ঋজুদা। আমি না-নেমেই বাঁদিক থেকে ডানদিকে চলে এলাম ড্রাইভিং সীটে। গাড়ি স্টার্ট করতেই ঋজুদা পাইপটা ধরিয়ে বাঁ হাতটা জানলাতে রেখে, পথের সামনে সোজা তাকিয়ে বসে রইল।

বলল, গাড়ি আস্তে চালা—চল্লিশ কি মি-র উপরে তুলবি না।

তরপরই আমার পাশে বসা জলজ্যান্ত মানুষটা পাইপ আর ভাবনার ধোঁয়ায় যেন অদৃশ্যই হয়ে গেল।

আমরা যখন মালোয়ামহলে ফিরে এলাম তখন দুপুরের খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। যদিও খিদে একটুও নেই। ভানুপ্রতাপ অথবা বিষেণদেওবাবু, দুজনের একজনও মহলে ছিলেন না। বিষেণদেওবাবু গেছেন ত্রিজনন্দনকে নিয়ে উজ্জয়িনপুরের রাজবাড়ি থেকে আনা বেনারসী ল্যাংড়া আমের কলম বসাতে নিজের বাগানে—। আর ভানুপ্রতাপ গেছেন গীমারীয়া। কেন গেছেন, কেউ জানে না।

আমরা গ্যারাজে গাড়ি রেখে ভিতরে ঢুকতেই-না-ঢুকতেই তুমুল বৃষ্টি নামল। ঝড়কে সঙ্গে করে। দুড়দাড় করে অত বড় মহলের দরজা জানালা পড়তে লাগল। লোকজন ছুটোছুটি করতে লাগল সেসব বন্ধ করার জন্য। ঠাণ্ডা, ভেজা হাওয়া বইতে লাগল জোরে। ঝরে যাওয়া পাতা আর ফুল উড়তে থাকল। একঝাঁক হুইসলিং টীল জঙ্গলের মধ্যের কোনো তালাও থেকে উড়ে আসতে লাগল উত্তর থেকে দক্ষিণে।

আমরা আমাদের ঘরে গেলাম। নীচে বলে গেলাম যে, ওঁরা এলে খাওয়ার জন্যে তৈরি হলে, তখন আমাদের খবর দিতে।

ঋজুদা আমার ঘরে ঢুকেই বলল, আজ থেকে এক ঘরেই শুতে হবে। বুঝলি। যা ঘটল, তারপর তোকে একা ছেড়ে দেওয়া যায় না।

আমি বললাম, হাত খালি যে। কিছুই আনতে দিলে না তুমি। আমার হাতে একটা কিছু থাকলে—ঐ শীস দেওয়া গাব্বুন ভাইপারের বাবাকে আমি ঐ বরা পাতার উপর শুইয়ে দিতাম।

ঋজুদা চুপ করে রইল। আমরা দুজনেই জানতাম যে, এ সময় কাঁচ নামিয়ে ঋজুদা পিস্তল বের করলেই সঙ্গে সঙ্গে হাতে ছোবল দিতো ঐ সাপ। সাপ মারতে শট্‌গান হচ্ছে সবচেয়ে ভাল। চার নম্বর কি ছ' নম্বর ছররা দিয়ে দেগে দিলেই হল মাথাতে। মাথায় সুবিধে না হলে কোমরে। কোমরে গুলি লাগলেই, সময় পাওয়া যায়—পরের গুলি ধীরে সুস্থে মাথা লক্ষ্য করে করা যায়। অনেক সময় গাছের ডালে বা বাঁশের ঝাড়ে সাপ জড়িয়ে থাকলে তার মাথাটা যে কোথায় আছে, তা খুঁজে বের করতেই সময় লেগে যায় অনেক।

ঋজুদা ঘরে ঢোকার পর থেকেই আমাদের জিনিসপত্রের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে ছিল।

হঠাৎ বলল, আমাদের অবর্তমানে আমাদের জিনিসপত্র কেউ ঘাঁটাঘাঁটি করে গেছে। বুঝলি ?

কি করে বুঝলে ?

আমার ব্যাগের জীপ-ফাস্‌নারটা আমি ইচ্ছে করেই আধ ইঞ্চি মত খুলে রেখে গেছিলাম। দাখ যে খুলেছিল, সে কিন্তু পুরোটাই বন্ধ করে দিয়েছে।

তারপর বলল, তোর জিনিস সব ঠিক ঠিক আছে ত' ?

আমি আমার স্যুটকেস খুলে দেখলাম। সবই ঠিক আছে। শুধু আমার এ্যাড্রেস-বইটা নেই। ছোট্ট বই ; তাতে আমার পুরো নাম ঠিকানা লেখা ছিল। সকলের ফোন নম্বরও।

ঋজুদাকে বললাম সেকথা।

ঋজুদা বলল, এখানে ফোন থাকলে গদাধরকে বলে দিতাম।

অতিথিদের আদর-আপ্যায়ন করতে ভাল করে। আমাদের ত' কম যত্ন করছেন না এঁরা। আমাদের খোঁজ করতে কি নিখোঁজ করতে গেলে এঁদের মধ্যেই কেউ যাবেন। অথবা এঁদের লোকজন।

কেউ মানে ? বিষেণদে.....

ঋজুদা ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে কথা বলতে মানা করল আমাকে। বারান্দাতে কারো পায়ের শব্দ শোনা গেল।

হুজৌর।

কওন ? ঋজুদা বলল।

ছোট্টু।

বোলো।

হুজৌর লৌগ আ গ্যয়া। পঁন্দরা মিনিট বাদ খানেকে লিয়ে আইয়ে আপ্‌লোগ নীচে।

ঠিক হ্যায়। বলল ঋজুদা।

ঋজুদা বলল, রুদ্র। আজ দুপুরে খাওয়ার পরই আমাদের পেট আপসেট হবে দুজনেরই। এবং তোর টেলিগ্রামটা না-এসে পৌঁছনো অবধি আমরা বাড়ির মধ্যেই

থাকব। বাড়ির মালিকরা বাড়ির বাইরে গেলে বাড়িটার মধ্যে ঘুরে ঘুরে ভাল করে দেখতে হবে বুঝলি।

বললাম, ঠিক আছে। কিন্তু এত লোকজন। পারবে?

পারতে হবে। ওরা আমাদের জিনিস ঘেঁটে যাবে, চুরি করবে, আর আমরা কেন করব না।

খেতে এসে আমি অথবা ঋজুদা যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে গল্প-গুজব করতে করতেই খেলাম।

বিষেণদেওবাবু বললেন, কাল সব ঠিকঠাক থাকলে, মানে আমাদের সকলের শরীর-স্বাস্থ্য, কাল সকালেই ছুলোয়া করব। অ্যাল্‌বিনোর জন্যে।

ভানুপ্রতাপ বললেন, আমি জগদেওকে জিজ্ঞেস করলাম, ও বলছে ও নাকি অ্যাল্‌বিনোকে দেখেইনি। তবে কে দেখেছে। আসোয়া আর রত্না। আসোয়ারা কোথায়?

ওরা গেছে মাইন্‌সে।

মাইন্‌স কেন?

ভানুপ্রতাপ সন্দিগ্ধ গলায় শুধোলো।

মাইন্‌সে নাকি একটা নেকড়ে, বাচ্চা ছেলেদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। পাঁচ-পাঁচটি বাচ্চা নিয়েছে—তিন থেকে ন' বছরের। তাইই ওদের পাঠিয়ে দিলাম।

কবে পাঠালে?

এই ত' আজ সকালেই।

আজ সকালে? খবর নিয়ে এল কে?

গুণ্ডারিলালকে দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলো ম্যানেজার আজ খুব ভোরে।

বাসে এলো গুণ্ডারিলালের লোক? কখন এল? দেখিনি ত'। ভোরে কোন্ বাস আছে?

তুই ত' শুনেছিলি। বাসে আসেনি, এসেছিল ডিজেলের জীপ নিয়ে। আসামাত্র ওদের আসোয়ার বাড়ি পাঠিয়ে পত্রপাঠ ওদের দুজনকে তুলে নিয়ে চলে যেতে বলে দিয়েছিলাম। আজকাল ত' পান থেকে চুন খসলেই মালিকের দোষ। জঙ্গলের নেকড়ে খনির কুলীদের বাচ্চা ধরে নিয়ে যাচ্ছে, তার পিছনেও মালিকের ষড়যন্ত্র আছে বলে রটে যাবে। তাইই, আর দেরী করলাম না।

ভানুপ্রতাপকে যেন ভূতে পেয়েছে। আবারও বললেন, আসোয়ারা কোন্ দিকে অ্যাল্‌বিনোর পায়ের দাগ দেখেছিলো?

যেখানে মাচা বাঁধা হয়েছে—সেখানেই ত' দেখেছিল বলল।

পিস্‌কি নদীতে? ভানুপ্রতাপ আবার শুধোলেন।

হ্যাঁ। তাইই ত' শুনেছি।

বিষেণদেওর গলা আস্তে আস্তে নরম হয়ে আসছিল ভানুপ্রতাপের জেরার তোড়ে।

কিন্তু ব্যালিস্টিক্ মিসিল-এর মত বারোফুটি শীস দিয়ে কন্ট্রোল-করা সাপ ছেড়ে এরা মামা-ভাগ্নেতে অ্যাল্‌বিনো বাঘটাকে নিয়ে যে কেন পড়লেন বুঝলাম না। অথচ সাপটার কথা আমরা ভুলেও উচ্চারণ করতে পারছি না। মধ্যে এই গোলমালে এ জন্মে অ্যাল্‌বিনো মারার চান্সটাই আমার হাতছাড়া হবে মনে হচ্ছে। মনই খারাপ হয়ে গেল। কাল সকালেও ছুলোয়া হবার নয়, কারণ দুপুরের খাওয়ার পর আমাদের দুজনেরই ত' আবার পেট-আপসেট করবে। পেটের মধ্যে কি হয় না হয় তা একমাত্র পেটের মালিকই জানে।

তাই পেটের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় নেই আমাদের।

ভানুপ্রতাপ বললেন, আজ বিকেলে ভাবছি, একবার পিস্‌কি নদীতে গিয়ে পাগ-পার্কসগুলো দেখে আসব।

বিষেণদেওবাবু বললেন, খালি হাতে যাস্ না; আর একাও নয়। অত বড় বাঘ। বুড়োও হয়েছে। কি রকম মেজাজ থাকে, কে বলতে পারে?

ভানুপ্রতাপ ঋজুদাকে বললেন, চলুন না, বিকেলে ঘুরে আসি।

ঋজুদা খুশী মুখে বলল, যাব। ভালোই ত'। ঘুরে আসা হবে।

বিষেণদেওবাবু হঠাৎ বললেন, পিস্‌কি নদী কোথায় আপনি জানেন? ওদিকে গেছিলেন নাকি এদিকে আসার পর?

পিস্‌কি? ঋজুদা যেন আকাশ থেকে পড়লো।

বলল, এসব জঙ্গল আমার অচেনা। পিস্‌কি নদী কোথায় তা তো জানি না আমি। বলেই, ইচ্ছে করে হাত ঘুরিয়ে পিছন দিকে নাচ-ঘরের দিকে দেখালো। বলল, ঐদিকে?

না, না ওদিকে নয়। ভানুপ্রতাপ বললেন।

তারপর বললেন, কাল রাতে কোনো অস্বাভাবিক আওয়াজ শুনেছিলেন? আপনাদের দুজনের কেউ?

আওয়াজ? হ্যাঁ। ব্রিজনন্দনজী গিয়ে আমাদের সাবধান করে দিলেন।

ব্রিজনন্দন? বিষেণদেও জিজ্ঞেস করলেন—ওঁর মুখে একটা রাগের ছায়া এসেই সরে গেল। অবাক গলায় বললেন, ব্রিজনন্দন গেছিল আপনাদের সাবধান করতে?

ভানুপ্রতাপ বললেন, হ্যাঁ। আমিই বলে দিয়েছিলাম।

তারপর?

বিষেণদেও ঋজুদার চোখে চোখ রেখে বললেন।

তারপর এই আপনার রুদ্রদাদুরবাবু। এতটুকু ছেলে এমন বাজের মত নাক ডাকে পাশে শুয়ে যে, বাইরের কোনো শব্দই কী আর শোনার উপায় ছিল? নইলে ভূত-পেত্নীর আওয়াজ কখনও শুনিনি, শোনার ইচ্ছে ছিল খুবই।

আপনারা কাল এক ঘরে শুয়েছিলেন বুঝি? বিষেণদেওবাবু শুধোলেন।

হ্যাঁ। ভয়ে। ছেলেটি কান্নাকাটি শুরু করে দিল। আমিও মশাই ছোটবেলা থেকে জঙ্গলে জঙ্গলেই কাটিয়েছি—জন্তু জানোয়ারের ভয় আমার নেই—সে যে জন্তুই হোক আর যত হিংস্রই হোক—বলেই আড়চোখে চাইল একবার আমার দিকে। তারপর বলল, কিন্তু এই অশরীরী ব্যাপারগুলো সম্বন্ধে আমার, ঠিক ভয় বলব না; অস্বস্তি আছে একটু। এড়িয়ে যাবারই চেষ্টা করি সবসময়। তবে রুদ্র নাক না-ডাকালে শুয়ে শুয়ে শুনতে আপত্তি ছিলো না।

বিষেণদেওবাবু খাবারের থালায় মুখ নামিয়ে বললেন, তাহলে বলুন ভানু ভালই করেছিল ব্রিজনন্দনকে পাঠিয়ে আপনাদের কাছে। ভানুর দায়িত্বজ্ঞান, কর্তব্যজ্ঞান বাড়ছে আস্তে আস্তে। খুব ভাল। খুবই ভাল বলতে হবে

ভানুপ্রতাপ বললেন, ঠাট্টা করছো মামা?

ঠাট্টা? সত্যিই বলছি। কথাটা শুনে খুব ভাল লাগল। এই ত' চাই। মেহমানদের দেখভাল সকলে করতে পারে না; জানেও না। এর মধ্যেও খানদান-এর ব্যাপার থাকে। তোর বাবার গুণটা পেয়েছিস দেখে ভাল লাগছে।

ঋজুদা আমার ঘরের খাটে বালিশে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে পাইপ খাচ্ছিল।

বলল, একটু আরাম করে নে রুদ্র। ঘণ্টাখানেক পর বাথরুমে গিয়ে, গলায় আঙুল দিয়ে বমি করতে হবে। যত জোরে পারিস ; শব্দ করে।

মুরগী-মুসল্লমটা বড় ভালো করেছিল, উগরে দিতে বলছ ?

আমি বললাম।

হ্যাঁ। সরি রুদ্র। উগরেই দিতে হবে। গোয়েন্দাগিরির সবে হাতেখড়ি হচ্ছে আমাদের। অনেক কিছুই করতে হবে। গোয়েন্দাগিরি কি চাট্টিখানি কথা ?

আমি বললাম, ঋজুদা, কেস্টার কি বুঝছ ? কিছু কি ক্লু পেয়েছো ? মাডরি-টাডরি হবে নাকি ?

যে-কোনো মুহূর্তে। ঋজুদা গম্ভীর মুখে বলল।

তারপর বলল, আজ সকালে তোকে দিয়েই এ্যাকাউন্ট ওপেন করে ফেলেছিল প্রায়। একটুর জন্যে মিস্ করে গেল।

সকাল থেকে আমার চোখের সামনে কেবলি সাপটার চেহারা ভাসছিল। ভাবলেই, গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল আমার। কী একখানা সাপ !

ঋজুদাকে বললাম, ওটা কি সাপ ঋজুদা ?

তখন থেকে আমিও বোঝবার চেষ্টা করছি। কাছাকাছি এসেছি, তবে ঠিক কী-না জানি না। কোলকাতা গিয়ে বাদুর স্নেকপার্কে গিয়ে দীপকবাবুকে জিজ্ঞেস করতে হবে আমার অনুমান ঠিক কী-না। ভদ্রলোক খুবই ওয়েল-ইনফর্মড এসব ব্যাপারে।

সাপেদের নাকি কান নেই। আমি বললাম।

না কান নেই। কিন্তু সাপেরা যে শুনতে পারে এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। ম্যালকম্ স্মিথ-এর রেপ্টালিয়া এন্ড অ্যাম্ফিবিয়া বইয়ের খুব সম্ভব তৃতীয় চ্যাপ্টারে, যেখানে সার্পেন্টিস্ সম্বন্ধে উনি আলোচনা করেছেন, সেখানে উনি বলেছেন : It is difficult to say much this lack of auditory apparatus has affected their hearing, or whether they have any compensatory machanism to make up for it, but that they can hear very well is indisputable.

তারপর বলল, আসলে, যে-কোনো শব্দ যে তরঙ্গ তোলে আবহতে, তাতেই সাপেরা শুনতে পারে। ওদের একটিমাত্র sensory area আছে—তাকে বলে Papilla basilaris. সেই জায়গাতেই শব্দ-তরঙ্গ লহরী তোলে। তাই শীষ্ দিয়ে যে লোকটি ঐ এতবড় বিষাক্ত সাপকে শত্রুনিধনের জন্যে ব্যবহার করছে, তাকে বাহাদুরী দিতে হয়। পাকা সাপুড়ে।

সাপটা কি সাপ তা ত' বললে না ?

যতদূর মনে হচ্ছে, সাপটা ওফিফাগাস্ ভ্যারাইটীর। আমাদের পুরাণ সাহিত্যে যাকে নাগ বলে। নাগের মধ্যে এ হচ্ছে যম-নাগ। খালি অন্য সাপ খেয়েই থাকে এরা। বড় গাছের কোটরে অথবা বড় বড় গাছের ডালে পেঁচিয়ে থাকে। অ্যালবার্ট গান্থার সাহেব, আঠারশ একষট্টি সালে তাঁর যে বিখ্যাত বই লিখেছিলেন, দ্যা রেপটাইলস্ অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, সে-বইতেও তিনি এ-সাপের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। পাওয়া যায় অনেকই জায়গায়, কিন্তু খুবই দুষ্প্রাপ্য সাপ। এর কামড় একবার খেলে আর দেখতে হত না। অবশ্য যদি পেট-ভরা থাকে সাপেদের, তাহলে বিষের তেজ কম হয়। সব বিষাক্ত সাপই

যত উপোস থাকবে, তার বিষ তত বেশি হবে।

আফ্রিকাতে আছে এই সাপ ? আমি ঋজুদাকে শুধোলাম।

ঋজুদা উত্তর না দিয়ে কী যেন ভাবছিল পাইপ খেতে খেতে।

আসলে এই সাপ ব্যাপারটা আমার মোটেই পছন্দ নয়। ছোট কি বড়, বিষধর কি নির্বিষ ; যে-কোনো সাপ দেখলেই আমার গা-ঘিন্‌ঘিন্ করে। মা-বাবার সঙ্গে একবার স্কুলের ছুটিতে বিন্ধ্যাচলে বেড়াতে গিয়ে একটা শঙ্খচূড় সাপ মেরেছিলাম। ওখানে যে-বাড়িতে ছিলাম আমরা, সেখানে একটি মেয়ে কাজ করত। সে একদিন সকালে দৌড়ে এসে কেঁদে পড়ল। তার ছেলেকে শঙ্খচূড় সাপে কামড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শেষ। আর তাদের গ্রামের পথের পাশেই একটা গর্তমত জায়গায় বাঁশঝাড়ের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে সাপটা। লোকেরা লাঠি নিয়ে গেছিল মারতে, তাদের এমন তাড়া করেছে যে, তারা পালিয়ে এসে বেঁচেছে কোনোক্রমে। বন্দুক নিয়ে গিয়ে মেরেছিলাম সাপটাকে—কিন্তু গুলি খাওয়ার পরও তার কী আস্ফালন। গর্তর মধ্যে বাঁশগাছগুলো সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিলো। এখনও মনে হলে, ভয়ে গা শিউরে ওঠে। গ্রামের লোকেরা আমায় কাঁধে করে বাড়ি নিয়ে গেছিল, ছোট্ট ছেলে বলে—। মা খুব আদর করেছিলেন আর বকেওছিলেন।

ঋজুদা তখনও কি ভাবছিল।

আমি আবারও বললাম, আফ্রিকাতে আছে ? ঋজুদা ?

ঋজুদা বলল, না। এই সাপ নেই। এদের দেখা যায় সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও, ফিলিপিনস্, আর আন্দামানে। ডুমেরিল সাহেব অবশ্য বলেছেন যে, নিউগিনিতেও এই সাপ দেখেছিলেন তিনি।

ঋজুদা বলল, আমি শুধু ভাবছি, এমন এক সাপ পোষ মানিয়ে এমন কাজে কে লাগাতে পারে ?

তারপরই বলল, উত্তরপ্রদেশে বেহেড়িয়া বলে একটি সম্প্রদায় আছে, তারা বন্য-প্রাণী বশ করতে ওস্তাদ। তোদের ঐ বিন্ধ্যাচলের কাছেই মীর্জাপুর জেলায় শিউপুরা গ্রামে একটা লোক আসত বিন্ধ্যাচল পাহাড় থেকে নেমে ; ওখানে জেঠুমণির সঙ্গে আমিও একবার গেছিলাম, সেই লোকটা ছিল ঐ সম্প্রদায়ের। সে আমাকে বলত যে, ও কুমীরের সঙ্গে কথা বলতে পারে। সেইই ত' জেঠুমণিকে একবার শম্বর মারার জন্যে নিয়ে গিয়ে ভুল করে মীর্জাপুরের কুখ্যাত লেঠেলদের গ্রামের পেছনের দু'পা বাঁধা একটা ঘোড়া মারিয়েছিল। রাত্তির বেলা।

আমি ঋজুদার কথা শুনে হেসে ফেললাম। বললাম, জেঠুমণির কাণ্ড।

ঋজুদা বলল, সব বেহেড়িয়াই যে ওরকম আনাড়ি তা নয়। বেহেড়িয়ারা সব পারে।

হঠাৎ ঘড়ি দেখে ঋজুদা বলল, রুদ্রদদরবাবু আপনার পেট-আপসেট হবার টাইম হয়েছে। প্রথমে জোর বমি। তারপর ঘড়ি ধরে পনেরো মিনিট বাদে বাদে তুই আর আমি দুজনেই বাথরুমে যাব। এত জোরে শব্দ করে ফ্লাশ টানতে হবে যে মনে হবে বাড়ি বুঝি ভেঙেই পড়ল। আওয়াজটা ত' বিষেণদেওবাবু আর ভানুপ্রতাপের শোনা দরকার। কি বলিস ?

গুরু-আজ্ঞা। অতএব আমার পেট গড়বড় হল। গুরুরও হল। তবে কম। কিন্তু তখন যদি জানতাম এর পরিণাম কি হতে পারে।

বিকেল চারটে নাগাদ বারান্দায় পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। আমরা ভাবলাম, বেয়ারা চা

নিয়ে আসছে। ঠিক করেছিলাম, বেয়ারাকে চা রেখে যেতে বলব, তারপর চলে গেলে মাঠরী এবং বোঁদে মেরে দেব। ফাস্টক্লাশ টেস্ট।

কিন্তু যে এল, সে বেয়ারা নয়। স্বয়ং বিষেণদেওবাবু।

বললেন, মনে হচ্ছে কারো শরীর খারাপ। যে বেচারী হ্যান্ডপাম্প দিয়ে কুঁয়ো থেকে জল তোলে ওভারহেড-ট্যাঙ্কে সে এসে বলছে ট্যাঙ্কের জল শেষ। খুবই কি বেশি অসুবিধে।

ঋজুদা কি বলবে ভেবে না পেয়ে বলল, আসুন আসুন। তারপর আমাকে দেখিয়ে বলল, ছেলেটা মারা যাবার উপক্রম। আপনি আসবেন ভেবে আগে খবর দিইনি, তাছাড়া এতটা যে বাড়াবাড়ি হবে তাও.....হাতের জল শুকোতে পাচ্ছে না।

এত অসভ্য ঋজুদাটা! এই ভাষা বলতে পারে ঋজুদা, তা আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। কিন্তু গোয়েন্দাগিরি করতে গেলে অনেক কিছুই করতে হয়।

সঙ্গে সঙ্গে বিষেণদেওবাবু বললেন, সারা দুপুর ফ্লাশ টানার ঘনঘন আওয়াজ শুনেই আমি বুঝেছিলাম। যাকগে, আমি ওষুধ নিয়েই এসেছি সঙ্গে করে। জংলী জায়গা। হাতের কাছে সব ওষুধই মজুত রাখতে হয়।

আমি মনে মনে বললাম, সাপের হাত থেকে বেঁচেছি, এবার ওষুধ বলে বিষ খাইয়ে দেবেন ইনি।

আমার চোখের ভাষা ঋজুদা বুঝল।

বলল, কি ওষুধ? দেখি! বলেই, ওষুধটা ইজীচেয়ারে-বসা বিষেণদেওবাবুর হাত থেকে নিল। এন্টারোস্টেপ। পড়ল নামটা।

চারটে ক্যাপসুল নিয়ে এসেছিলেন উনি।

ঋজুদা বলল, খাইয়ে দেব ওকে।

বিষেণদেওবাবু বললেন, দেব নয় মশাই, এক্ষুনি খাওয়ান। এখানে অসুখ বেড়ে গেলে আর কিছু করার থাকবে না।

ঋজুদার মুখের ভাব করুণ হয়ে উঠল। হঠাৎই বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল আমার সঙ্গে। বলল, আমারটা তেমন সীরিয়াস নয়—ঐ আপনার রুদ্রুদ্দরবাবুরই কেস খুব সীরিয়াস।

বিষেণদেওবাবু হঠাৎ ইজীচেয়ার ছেড়ে উঠে লাল-ভেজা-কম্বলে ঢাকা মোরাদাবাদী কলসী থেকে রুপোর গ্লাসে নিজের হাতে জল ঢেলে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, আও বেটা, দাবা লে লেও। চার-গোলী একসাথ।

ওঁর সামনেই খেতে হল। সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় চার-চারটে এন্টারোস্টেপ। বলতে গেলে কলেরারই ওষুধ।

ওষুধ খাইয়ে বিষেণদেওবাবু ঋজুদাকে বললেন, বিকেলে হাঁটতে বেরোবেন না?

ঋজুদা বলল, দেখি, এখন ছেলেটা কেমন থাকে।

বিষেণদেওবাবু ঋজুদাকে বললেন, চা পাঠিয়ে দিই গিয়ে?

ঋজুদা বললেন, দিন। শুধু আমার জন্যে।

বিষেণদেওবাবু চলে যেতেই, আমি ঋজুদার দিকে তাকালাম।

ঋজুদা ডান হাতে পাইপ ধরে বাঁ হাতটা আমার নাকের সামনে তুলে বলল, তুই শার্লক-হোমস পড়েছিস?

আমি উত্তর না দিয়ে বললাম, এটা কি হল? তুমি এমন করে লেট-ডাউন করলে

আমাকে। নিজে কেটে গেলে; আমাকে ডুবিয়ে।

ঋজুদা বলল, রুদ্র, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ইটস ওল্ ইন দ্যা গেম।

আমি স্তোকবাক্যে না ভুলে প্রায় কেঁদে ফেলে বললাম, ঈসস-স। বললাম, কাল সকালে কি হবে আমার?

সেইটাই হচ্ছে কথা। বলেই, ঋজুদা একবার উঠে গিয়ে বারান্দায় কেউ আছে কি নেই দেখে নিয়েই হো হো করে হেসে উঠল।

তারপর আমার কাছে এসে বলল, সরী, ভেরী ভেরী সরী; রুদ্র।

আমি ভাবছিলাম, কালকে সারাদিন, অথবা কে জানে পরশুও হয়ত আমার কেবলই মনে হবে এর চেয়ে বিষেণদেওবাবু আমাকে বিষ খাওয়ালেই খুশী হতাম।

ঋজুদার জন্যে চা এল। মাঠরী এবং বোঁদেও এল।

ঋজুদা আমার দিকে চেয়ে বলল, লোভে পাপ; পাপে মৃত্যু।

তারপর বলল, যাক ওয়াট্‌সনের খাতিরে শার্লক হোমস না-হয় আজ শুধু চা-ই-ই খেল। মাঠরী এবং বোঁদে স্যাক্রিফাইস করলাম আমি তোর জন্যে। বুঝলি কমরেড।

আমরা বিকেলে বারান্দার চেয়ারে এসে বসলাম। বাইরে বেলা পড়ে এসেছিল। নাচঘরের কাছে বুনো নিমের সবুজ অন্ধকারের মধ্যে অল্প কটা ইউক্যালিপটাসের সাদা নরম গা-মাখা দারুণ কনট্রাস্ট-এর সৃষ্টি করেছে। সাদা নরম গাছের গায়ে প্রথম ভোরে এবং শেষ দিনের আলো যেমন করে আলতো হাতে রঙ লাগায় এমন আর কোনো গাছেই লাগায় না। সুন্দরবনের সাদা বাদীগাছ, পালামৌর চিলবিল আর আফ্রিকার ইয়ালোফিভার এ্যাকাসিয়াকে গোধূলির আলোতেই দেখতে হয়।

এক ঝাঁক টিয়া এক স্কোয়াড্রন সবুজ ক্ষুদে জেট-প্লেনের মত উড়ে যাচ্ছে। কোট্‌রা হরিণ ডাকছে পশ্চিমের জঙ্গল থেকে। নানারকম পাখির মিশ্র আওয়াজ। হঠাৎ নিঃশব্দ পায়ে দিন চলে গিয়ে যে রাত এলো, তা বোঝা গেল যখন একটা হুতুম প্যাঁচা তার কামানের গোলার মত ডাক ছুঁড়ে গার্ড-অফ-অনার দিল রাতকে। দুররুম্ দুররুম্ দুররুম্-ম-ম্।

আমার অবস্থা কাহিল। মিথ্যা পেট্ আপসেট হওয়াতে এবং সত্যি এন্টারোস্টেপ্ খাওয়াতে। তাই বিষেণদেওবাবু এবং ভানুপ্রতাপ দুজনেই উপরে এলেন। কাল সকালে ছুলোয়ার বন্দোবস্ত করবেন কি করবেন না তা নিয়ে আলোচনা হল। ঋজুদা যেহেতু ওষুধ খায়নি, বলল, আমি ত' যেতে পারিই, কিন্তু আমি ত' মারব না—যার সবচেয়ে উৎসাহ বেশি, সেই-ই যদি...।

বিষেণদেওবাবু বললেন, দাবা লেনেকা বাদ ভি টাট্টী.....!

এত অসভ্য। ভাবলাম আমি। ঋজুদার উপর ভীষণই রাগ হল।

বিষেণদেওবাবু বললেন, তব্ ঔর্‌ভি চার-গোলি মাঙ্গাতা ম্যায়। খা লেও তুরন্ত্।

শুনে, ভয়েই আধমরা হয়ে গেলাম আমি।

বললাম, না না, ওষুধ খাওয়ার পর আর.....একেবারেই.....

ঋজুদা আমাকে সহানুভূতি দেখানোর জন্যে বলল, ও ত' রাতে কিছুই খাবে না, আমিও খাবো না। কালকে ছুলোয়া না করলেই ভাল। রুদ্র বেচারী। মারতে না পারুক, দেখতে ত' পারবে অ্যাল্‌বিনো বাঘটাকে।

দেখতে মানে? মারতেও পারবে জরুর। বিষেণদেওবাবু বললেন। আসোয়া আর তার বেটা রত্ন নিজের চোখে দেখেছে।

বললাম, কেমন দেখতে ?

ছাই-ছাই রঙ, কটা চোখ, আর দাড়ি-গোঁফওয়ালা হলুদ একটা ঘোড়ার মত দেখতে। দিখ্‌কে দিমাগ্‌ খারাপ হো যায়গা।

শুনেই দিমাগ খারাপ হচ্ছিল আমার। তারপর কিছুক্ষণ গল্প-গুজব করে ওঁরা নেমে গেলেন। বললেন, রাতে মিছরির শরবত খেয়ে যেন শুই।

ওঁরা চলে গেলেই আমরা ঘরের ভিতরে এলাম। ঋজুদা বলল, এর আগেও অ্যাল্‌বিনোর যা ডেসক্রিপ্‌শান ওঁরা দিয়েছেন তার সঙ্গে কিন্তু আসল অ্যাল্‌বিনোর চেহারা মিলছে না। আমি মধ্যপ্রদেশের ভীণ্ডার রাজার কাছে অ্যাল্‌বিনোর গল্প শুনেছি। উনি একটা মেরেছিলেন, যখন তোর মত বয়স ওঁর। অ্যাল্‌বিনোর গায়ের রঙ, লোম, সব সাদা হয়। আর চোখের রঙ হয় গোলাপি অথবা হাল্‌কা নীল। ভীণ্ডার রাজার বাঘটার চোখের রঙ ছিল গোলাপি। বুঝতে পারছিস ? এই মালোয়া-মহল ঘিরে অনেকই রহস্য আছে। এক নম্বর রহস্য অ্যাল্‌বিনো। দু' নম্বর, নাচঘর। তিন নম্বর, ভূত। চার নম্বর, ভূতের ঘোড়া। পাঁচ নম্বর, পেত্নী। ছ' নম্বর, পেত্নীর গান। সাত আর আট নম্বর ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ার। ন'নম্বর, ওফিকাগাস সাপ। দশ নম্বর, ভানুপ্রতাপের বাবা ও মার হঠাৎ এবং এত অল্প দিনের ব্যবধানে মারা যাওয়ার রহস্য।

আমি বললাম, আরও একটা রহস্য আছে।

কি ? ঋজুদা বলল।

ভানুপ্রতাপের বিদেশী ট্যুওয়ার গাড়িটা দেখেছিলে ?

হ্যাঁ। ঋজুদা বলল।

আমাকে প্রথম দিন রাস্তায় দেখা হতেই তুলে নিয়ে গেছিলেন উনি গীমারীয়াতে। মনে আছে ?

হ্যাঁ।

ঐ গাড়িতে খস্‌স্‌ আতরের গন্ধ পেয়েছিলাম—আর সেই গন্ধ ছাপিয়ে একটা বোঁটকা বাঘ-বাঘ গন্ধ। আমি জিজ্ঞেসও করেছিলাম, কিসের গন্ধ বেরোচ্ছে ?

ভানুপ্রতাপ বলেছিলেন ওঁর গাড়িতে উনি গরমের দিনে খস্‌স্‌ আর শীতের দিনে অম্বর আতর স্প্রে করিয়ে রাখেন।

হুম্‌ম্‌.....ম্‌। ঋজুদা বলল।

তারপর বলল, গন্ধটা বাঘ-বাঘ, তোর ঠিক মনে আছে ?

ঠিক বাঘেরই কি-না জানি না, তবে বাঘ-বাঘই মনে হয়েছিল।

তাহলে ; এগারো নম্বর—রহস্য বোঁটকা-গন্ধ। আমাদের এই এগারোটি রহস্য ভেদ করতে হবে ?

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, এটা অন্যায় নয় ? প্রথমেই কি কাউকে গোয়েন্দাগিরিতে ডক্টরেটের থীসিস্‌ সাবমিট করতে বলা উচিত ? বল্‌ রুদ্র ! একটু সোজা কেস এবং একটা-দুটো রহস্য দিয়ে ব্যাপারটা শুরু হলেই ভালো হত না ?

বললাম, ভালো ত' হত ! কিন্তু.....

॥ ৮ ॥

টেলিগ্রামটা যে এত তাড়াতাড়ি এসে যাবে আমরা কেউই ভাবিনি। কাল দুপুরে আমার যখন প্রাণ যায়-যায় অবস্থা—অসুখে নয়, ওষুধ খেয়ে ; তখনই টেলিগ্রামটা এল।

ভটকাই, আমার পিসতুতো ভাই, এবং ঋজুদার গ্রেট অ্যাডমায়ারার খুব প্রমপ্ট অ্যাকশান নিয়েছে। অনেকদিন ধরেই ওর আমাদের সঙ্গে আসার ইচ্ছা। ডিটেক্‌টিভ বই পড়ে পড়ে ও খুদে ডিটেক্‌টিভ হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। ঋজুদা হয়ত এর পরের বার ওকেও আমাদের সঙ্গে নেবে। ভটকাই সঙ্গে থাকলে একেবারে জমে যাবে ব্যাপার-স্যাপার। শারীরিক কারণে এমনিতেই কান্না পাচ্ছিল, তাই টেলিগ্রাম পেয়ে কাঁদতে অসুবিধে হয়নি একটুও। মনে মনে, মায়ের আয়ু বেড়ে যাবে এই প্রার্থনা করে, মায়ের অসুখের খবরে খুব কাঁদলাম।

ঋজুদা বিক্ষেণদেওবাবুদের মিথ্যে বলল, কবেকার টেলিগ্রাম কবে এলো। তবুও চলে যা রুদ্র, এক্ষুনি গাড়ি নিয়ে চলে যা। মা যদি ভাল থাকেন তবে ফিরে আসিস্‌ সঙ্গে সঙ্গে। তোর জন্যে আমরা দু'দিন অপেক্ষা করব। বীটিং করাবো না অ্যাল্‌বিনোর জন্যে। ওঁরা বললেন, আলবাৎ ! আলবাৎ ! ছেলেমানুষ, সবচেয়ে উৎসাহ বেশী ! ও না থাকলে !

আমাকে একা গাড়ি চালিয়ে যেতে সকলেই মানা করছিলেন। ঋজুদাও, দেখাবার জন্যে। আমি বললাম, ঠিক আছি আমি।

ধানবাদে গাড়ি রাখতে কোনো অসুবিধাই হয়নি। নারাং আয়রণ অ্যান্ড স্টীলের অরুণ নারাং খুব আদর-যত্ন করলেন রাতে। অনেক কিছু খেতে বললেন। কিন্তু খাব কি !

ঋজুদার বাড়ি পৌঁছে বেল দিতেই গদাধর গেট খুলল। আমি বললাম, কাউকে বলবে না যে আমি এসেছি। আমি আজ রাতেই ফিরে যাব। গদাধর বলল, কি গো খিচুড়ি খেইবে নাকি ?

ভীষণ রেগে বললাম, একদম্‌ খাওয়ার কথা বলবে না।

গদাধর আহত হল। আমি যে কতখানি আহত ; তা যদি গদাধর জানত !

চান করে নিয়ে সোজা মিনি ধরে চলে এলাম ড্যালহাউসী পাড়াতে। গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের পাশেই—ওয়াটার্লু স্ট্রীটের ঠিক মোড়ে কাথবার্টসন হ্যাপারের দোকান। আমি এতদিন এটিকে শুধু জুতোর দোকান বলেই জানতাম। কিন্তু একসময়ে এঁদের প্রধান ব্যবসা যে ছিল জংলী জন্তু জানোয়ারের চামড়া ট্যানিং করা, ট্রোফি মাউন্টিং করা, স্টাফিং করা, তা জানতাম না। কতটুকুই বা জানি আমি। কতদিনই বা জন্মেছি।

ম্যানেজার হালদারবাবুকে খোঁজ করতেই, আমাকে গুপী বলে একজন বুড়োমত লম্বা লোক ভিতরের ঘরে নিয়ে গেলো সুইং-ডোর ঠেলে। কোমরে কোঁচা গোঁজা, ধুতির উপরে সাদা ফুলহাতা শার্ট, আর ঘি-রঙের জিনের কোট পরে হালদারবাবু বসেছিলেন সামনে পানের ডিবে নিয়ে।

বললেন, কি চাই খোকা ?

আমার খুব রাগ হলো। এখনও খোকা। কাল থেকে আমার পৃথিবীর সকলের উপরই রাগ হচ্ছিল। যতক্ষণ না রাগের কারণটা ক্লিয়ার হচ্ছে, ততক্ষণ রাগ থাকবেই। তবু, রাগ না করে ঋজুদার চিঠিটা ওঁকে এগিয়ে দিলাম।

উনি আদ্যোপান্ত পড়লেন। পড়ে বললেন, করেছিই ত'।

কি করেছেন তা আর বললেন না।

খোকা, তোমার সঙ্গে বোসসাহেব কিছু পাঠাননি ?

আমি চমকে গেলাম।

—কি হল ? বোসসাহেব যে লিখেছেন আপনার হাতে.....

আমার মনে পড়ল, ঋজুদা একটা বড় খামও দিয়েছিলো বটে ওঁকে দেওয়ার জন্যে।

খামটা এগিয়ে দিলাম ব্রিফকেস থেকে বের করে।

উনি ওটাকে নিয়ে অন্য ঘরে চলে গেলেন, তারপর ফিরে এসে বললেন, হুঁ, মিঃ বোসকে বলবেন যে, তিনি যা ভেবেছেন তা ঠিক। কিন্তু এ জিনিস বোসসাহেব পেলেন কি করে?

আমি বললাম, তা ত' আমি জানি না।

অ! জানো না। স্ট্রেঞ্জ।

তারপর বললেন, বোসসাহেবকে বোলো যে, জিনিসটি ডেলিভারী দিয়েছি মাত্র মাস দেড়েক আগে। আমি বিল নম্বর অর্ডার নম্বর সব নোট করে রাখব। অর্ডার বুক, বিল বুক, ডেলিভারী বুক সব ঠিকঠাক রাখব। বোলো, কোনো চিন্তা নেই। বোসসাহেবের সঙ্গে ত' আমার আজকের সম্পর্ক নয়।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, বোসসাহেবের জেঠুমণি একবার একটা শম্বর মেরে তার চামড়া ট্যান করতে দিয়ে গেলেন। চামড়া ট্যান হতে না হতে দলে দলে লোক আসতে লাগলো, বুঝলে খোকা, সেই শম্বরের চামড়ার জুতো বানানোর জন্যে। অত বড় ব্যারিস্টার, কত জানাশোনা, সকলকেই একটি করে স্লিপ ধরিয়ে দিয়েচেন—যাও কাথবটিসন গেলেই জুতোর মাপ নেবেন ওঁরা আর শম্বরের চামড়ার জুতো বানিয়ে দেবেন। পয়সা দেবে না তোমরা কেউ।

আমার মজা লাগছিল, ঋজুদার জেঠুমণির কথা ওঠাতে।

হালদারবাবু বললেন, তা বোঝই ত' একটা শম্বরের চামড়াতে কি আর একশ তেত্রিশ জন লোকের দু'পাটি করে জুতো হয়?

—জেঠুমণি কি আবারও শম্বর মারলেন? আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম।

হালদারবাবু বললেন, মাতৃতা খারাপ; শম্বর কি মশা না মাছি যে, মারলেই হল? শেষে আমিই মুশকিল আসান করলুম।

—কি করলেন?

—ষাঁড়ের চামড়া দিয়ে জুতো বানিয়ে শম্বরের রঙ করে দিলুম—চামড়া চেঁচে রাফ্ করে নিয়ে। বোস সাহেবের সম্মান রাখা নিয়ে কতা। আমি কিন্তু কোনোই তঞ্চকতা করিনি। কোনো লোককে বলিওনি যে, শম্বরের চামড়াই দিচ্চি। বোসসাহেব জুতো বানাতে লিখেছেন, আমিও জুতো বানিয়ে দিয়েচি। ওঁদের সঙ্গে বোসসাহেবের কি কথা হল না হল আমি জানব কি করে? ব্যারিস্টার মানুষ। শম্বরের চামড়া শেষ হয়ে যাবার পর উনিও কোনো চিঠিতে লেখেননি যে, একে শম্বরের চামড়ার জুতো বানিয়ে দাও। শুধু লিখেছিলেন, জুতো বানিয়ে দেবেন। কতায় বলে, শতং বদ মা লিখ।

ঋজুদা যে খামটি দিয়েছিল সেটি আবার বন্ধ অবস্থায় ফেরত দিয়ে উনি বললেন, এসো খোকা।

এবার রাইটার্স বিল্ডিং-এ।

আই. জি. সাহেবের নামেও ঋজুদা একটা চিঠি দিয়েছিলেন। চিঠির উপরে লেখা, কোটাল-বন্ধু।

আই. জি. সাহেব চিঠি পড়েই বললেন, নো-প্রবলেম। আমি বিহারের আই. জি. সাহেবের অফিসে কথা বলে হাজারীবাগের এস. পি. ও ডি. এম.-কে ওয়্যারলেস করিয়ে দিচ্ছি। তারপর বললেন, তুমি ফিরবে কবে?

আজই বিকেলে। কোলফিল্ড এক্সপ্রেস ধরে রাতে ধানবাদে পৌঁছব। তারপর রাতটা ওখানে থেকে ভোরে গাড়ি নিয়ে যাবো মুলিমালোয়াঁতে।

আই. জি. সাহেব বললেন, তোমার ট্রেন কোলকাতা ছাড়বার আগেই যেখানে যেখানে খবর পৌঁছবার পৌঁছে যাবে। তারপর বললেন, এক সেকেন্ড বোসো, তারপর ওঁর পি. এ.-কে যেন কী বললেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার লাইসেন্সটা?

একটু পরই ওঁর ফোনটা বাজল।

উনি বললেন, তোমার পিস্তলের লাইসেন্স হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে ওক্কে হয়ে গেছে। তোমাদের গান-ডীলার ডেলিভারী নিয়ে গেছেন। গুডলাক। ঋজুবাবুকে বোলো। আমি উঠতে যাব, এমন সময় বললেন, স্টেশনে যাবার সময় লালবাজার থেকে ট্রান্সমিটারটা নিয়ে যেও। ঋজুবাবুকে বোলো—পাস-ওয়ার্ড হচ্ছে, "গুল্লি-অলি।" মনে রেখো, গুল্লি-অলি।

আমি ওখান থেকে বেরিয়ে ফেয়ারলি প্লেসে গিয়ে টিকিটটা কেটে ফেলেই চৌরঙ্গীতে ইস্ট-ইন্ডিয়া-আর্মস কোম্পানীর দোকানে গেলাম। ঋজুদার কথামত এ-বি বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম।

একজন ধুতিপরা, ফর্সা, খুব লম্বা, ভদ্রলোক, সামনের দিকে চুল কম, স্ট্রাইপড্-ফুলহাতা শার্ট কিন্তু হাতা-গুটিয়ে খদ্দেরদের নানারকম বন্দুক রাইফেল দেখাচ্ছিলেন। তাঁর কাছেই আমাকে নিয়ে গেল ছোটে বলে, খাকি প্যান্ট-শার্ট পরা একজন বেয়ারা।

এ-বি বাবু বললেন, কিসের জন্য আসা হয়েচে?

ঋজুদার চিঠিটা দিলাম ওঁকে।

উনি বললেন, অ! তুমিই সেই আফ্রিকা-ফেরত ছোঁড়া? কি যেন নাম, শূদ্র না কি যেন? যে, ঋজুবাবুকে চুষুণ্ডার হাত থেকে বাঁচিয়ে ছেল।

বললাম, শূদ্র নয়; রুদ্র। আর চুষুণ্ডা নয়, ভুষুণ্ডা।

উনি বললেন, ঐ হ'ল।

তারপর বললেন, অজিতবাবু, সেই লামা পিস্তলটা বের করুন ত'।

টু-টু বোরের একটা দারুণ ঝক্‌ঝকে পিস্তল লোহার আলমারী থেকে বের করে দিলেন অজিতবাবু।

এ-বি বাবু বললেন, নাও এইটে তোমার। ঋজুবাবু তোমাকে প্রেজেন্ট করেছেন রেজাল্ট ভালো করায়।

কিন্তু এটা আমার কেন বলছেন?

আজ্ঞে? কেন মানে? লাইসেন্স-এর অ্যাপ্লিকেশানে সই করার সময় দ্যাকোনি কিসে সই করছ?

—না ত'। ঋজুদা বলেছিল সই কর, সই করে দিয়েছিলাম।

—বেশ করেচো।

—কোন্ দেশী এটা?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

লামা? স্প্যানিশ্!

ও! আমি বললাম।

উনি বললেন, কি করে হ্যান্ডল্ করতে হয় জানো ত'?

এ্যাই দ্যাকো—এই হচ্ছে ম্যাগাজিন; এ্যাই এমনি করে গুলি ভ'রবে; এই দিলে ত'

ভেতরে, এই কক্ করলে ; আর এই হচ্ছে সেফ্‌টি। খুব সাবধান। এ বড় সব্বনাশা জিনিস্। বুয়েচো !

—বললাম, তা টু-টু পিস্তল দিয়ে কি মানুষ মরবে ?

—মরবে না ? বল কি হে তুমি ! আরে ঐ যে গো, আমাদের জ্যাকি কেনেডির দেওর গো, ধুত্তেরি আমার কিস্সুই মনে থাকে না, সেই থমাস কেনেডি না কি যেন ?

—রবার্ট কেনেডি ? আমি বললাম।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ ! সেই রবার্ট কেনেডি তাকে হোটেলে কোন্ পিস্তল দিয়ে মারলে ?

মরবে না মানে ? বুকের উপরের যে কোনো জায়গায় ঠুকে দেবে—ব্যস্ তার আত্মীয়রা গিয়ে নিমতলায় কাঠ কিনতে লাইন দেবে সঙ্গে সঙ্গে। কোনো দেরী নয়। এক দিক দিয়ে গুলি ঢুকবে, অন্য দিক দিয়ে প্রাণ বেরিয়ে যাবে।

তারপর একটুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে কি প্রতিক্রিয়া হ'ল দেখে নিলেন একটু।

তারপর বললেন, এই নাও। আর গুলিও নিয়ে যাও। লাইসেন্সটাও নাও। দাঁড়াও, এন্ট্রি করে নিই গুলিগুলো।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। এ-বি বাবু সটান উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন, এইটে নিয়ে আবার চলে যাও অস্ট্রেলিয়া, গিয়ে টুযুগুাকে সাবড়ে দিয়ে এসো।

আমি বললাম, আজ্ঞে অস্ট্রেলিয়া নয়, আফ্রিকা। আর টুযুগুা নয়, ভুযুগুা।

উনি বললেন, আরে যাও ত' ! ঐ হ'ল। ওতেই হবেথ'ন্।

বিরাট দোকানটা থেকে বেরুতে ইচ্ছে করছিল না আমার। কার্তুজের গন্ধ, বন্দুকের তেলের গন্ধ ; নেশা লেগে যায়।

ওখান থেকে বেরিয়েই বিশপ্-লেফ্রয় রোডে যাবার জন্যে ট্যাক্সি ধরলাম। পথে কিছু কেনাকাটা করে নিয়ে যেতে হবে ঋজুদার অর্ডার মাফিক।

ট্যাক্সিতে বসে ভাবছিলাম এ-বি বাবুর আসল নামটা যে কি তা ঋজুদাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। তবে আসল নাম যা-ই হোক, এ-বি নামটা আসলে বোধহয় অসম্ভব ভুলো।

ঋজুদার ফ্ল্যাটে ফিরে ভট্‌কাইকে ফোন করলাম। বললাম, থ্যাংক উ্য।

তারপর বললাম, বুঝলি, এবার আর শিকার-টিকার নয়। ডিটেকটিভ-গিরি।

ভটকাই হাসল। বলল, দেশের কী করুণ অবস্থা।

—মানে ?

—মানে, তুইও ডিটেকটিভ হলি।

—আমি বললাম, তোর সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করার সময় নেই আমার।

—ও বলল, সুনির্মল বসুর লেখা পড়েছিস ?

—মানে ?

—মানে উনি একজন তোর মত গোয়েন্দার গল্প লিখেছিলেন। তোরই মত সায়েন্টিস্ট। এবং ব্রিলিয়ান্ট গোয়েন্দা। সেই গোয়েন্দা এক দারুণ ছারপোকা বিধ্বংসী পাচন আবিষ্কার করেছিলেন। ছোট ছোট হোমিওপ্যাথীর ওষুধের শিশিতে সেই লাল-নীল পাচন বিক্রী করতেন, সঙ্গে ব্যবহার-বিধি লেখা থাকত—কাগজের মোড়কে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, কি লেখা থাকত জানিস ?

—কি ? আমি রাগের গলায় বললাম।

—লেখা থাকত—"সাবধানে ছারপোকা ধরিয়া, মুখ হাঁ করাইয়া এক ফোঁটা গিলাইয়া দিবেন—মৃত্যু অনিবার্য।"

আমি চুপ করে থাকলাম। ফালতু লোকের সঙ্গে কি কথা বলব।

ভট্‌কাই বলল, গুল্ দ্যা বেস্ট—টিক্‌টিকি।

আমি বললাম, এটা ইয়ার্কির ব্যাপার নয়। তোর সঙ্গে আর কথা নেই আমার। ঋজুদা বলেছে রোজ ফোন করে গদাধরদার খোঁজ নিতে—আর আমি এসেছিলাম তা যেন কেউ না জানে।

তারপর বললাম, মা ভালো আছে ত' ?

ভট্‌কাই বলল, সীরিয়াসলী ইল্।

আমি ফোন ছেড়ে দিলাম ঘটাং করে।

কথা ছিল, রাতে গিয়ে ধানবাদেই খাব, তারপর ভোর চারটেতে গাড়ি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাব। অরুণবাবু নিজে থেকেই বলেছিলেন যে, গাড়ি সার্ভিস করিয়ে, তেল-মবিল, ব্রেক অয়েল, গীয়ার ও ডিফারেন্সিয়াল অয়েল, ব্যাটারীর জল, চাকার হাওয়া সব চেক-টেক করিয়ে রেডি করে রেখে দেবেন যাতে সকালে গাড়িতে সোজা বসে স্টার্ট দিতে পারি।

স্টেশনে যাওয়ার পথে লালবাজার হয়ে যেতে হবে। ট্যাক্সিতে উঠেই পিস্তলটাকে একটু খুলে দেখলাম।

চুমু খেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু চারধারে লোকজন। কে কি ভাববে ; পিস্তলটা একটা নরম কিন্তু মোটা পলিথিনের হোল্‌স্টারে আছে। এই হোল্‌স্টারটা বেল্টের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলেই পিস্তলটা কোমরের সঙ্গে ঝুলবে। দেখা যাবে না, জামার তলায় থাকলে।

ভাবলাম, এবার এসো—ওফিফাগাস্ সাপ, অ্যাল্‌বিনো বাঘ...

কিন্তু এন্টারোস্টেপ ট্যাবলেটগুলো যে পিস্তল দিয়ে মারা যায় না।

॥ ৯ ॥

আমি যখন গিয়ে ঢুকলাম ধুলো-মাখা গাড়ি নিয়ে তখন বেলা প্রায় চারটে বাজে। ঋজুদারা সবাই চীনের বসবার হল ঘরে বসে গল্প করছিল।

সকলে হৈ হৈ করে উঠলেন। কি ব্যাপার ? এরই মধ্যে ? গিয়েই ফিরে এলে কি রকম ?

মা অনেক ভালো আছে। বাবা টেলীগ্রাম পাঠাতে বলেছিল আমার পিসতুতো ভাই ভট্‌কাইকে। বলেই, ঋজুদার দিকে তাকালাম, তারপর বললাম, বুঝতেই পাচ্ছো, কিরকম গেঁতো, ইরেস্‌পন্‌সিবল্ ভট্‌কাইটা ! যেদিন টেলিগ্রাম পাঠাতে বলেছিল, তার দু'দিন পরে পাঠিয়েছিলো। ততদিনে মা ভালই হয়ে গেছে বলতে গেলে। মধ্যে দিয়ে আমার এই হয়রানী।

মায়ের কি হয়েছিল ? বিষেণদেওবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

এ্যাই সেরেছে ! তা ত' জানি না। ঠিকও করিনি কিছু, কী বলব না বলব। মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল ঐ, ঐ, আমারও যা হয়েছিল—প্রায় কলেরারই মতন।

বিষেণদেওবাবু একটু ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকলেন আমার দিকে, তারপর বললেন, তাহলে দ্যাখো রুরুদ্দরবাবু, কেমন ওষুধ দিয়েছিলাম তোমাকে। চার গোলিতেই ফিট্।

আমি মনে মনে বললাম, আপনাকেও আমি এক গুলিতেই ফিট্ করে দেবো। দাঁড়ান

না।

ঋজুদা বললো, মা কি বললেন রে ?

আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, অ্যাল্‌বিনো মারা চাই-ই—চাই।

ঋজুদা বলল, তাহলে ত' ছুলোয়াটা কালই শেষ করে ফেলা যায়। কি বলো ভানুপ্রতাপ ? রুদ্র যখন মায়ের আশীর্বাদ টাশীর্বাদ নিয়ে সাত-তাড়াতাড়ি ফিরে এলো।

ভানুপ্রতাপ যেন ঘোরের মধ্যেই ছিল।

বলল, যা করার তা দেরী করার কি মানে হয় ? করে ফেলাই ভাল।

বলেই, বলল, তাহলে কি ঠিক করলে ? কালই হবে ? মামা ?

কালই হোক। তুই গিয়ে বস্তীতে ওদের একটু খবর-টবর দিয়ে রাখ ভোর পাঁচটাতে ছুলোয়ার জন্যে সকলে যেন তৈরী হয়।

বিষেণদেওবাবু বললেন।

আর কাউকে কি নেমন্তন্ন করবে ? ভানুপ্রতাপ বললেন।

ঋজুবাবু আমাদের মেহমান আর রুদ্রদদ্দরবাবু হচ্ছে গিয়ে আবার ঋজুবাবুর মেহমান। আমরাই জোর পার্টি লাগাব এখানে। কচি-শুয়োরের বার-বী-কিউ হবে মহলের কম্পাউণ্ডে। বিষেণদেওবাবু আবার বললেন।

—শুয়োর খান নাকি আপনারা ? আমি বললাম। আমি ভেবেছিলাম.....

বল কি রুদ্রদদ্দরবাবু। বন্য বরাহ ! শ্রীরামচন্দ্রেরও অখাদ্য ছিলো না। খেলে, জন্ম সার্থক।

ভানুপ্রতাপ উঠে গেলেন, আমাদের সকলের মাঝ থেকে।

বললেন, যাই একটু ঘুরে আসি।

কোথায় ?—ঋজুদা বলল।

এই লুলিটাওয়া থেকে। বোরড হয়ে যাচ্ছি দিনকে দিন, প্রতিমুহূর্ত।

বলেই, দুটো বড়ি মুখে পরলেন।

বিষেণদেওবাবু বললেন, সাবধানে গাড়ি চালাবি।

তারপর বললেন, আমিও একটু যাব, কাজ আছে। আপনারা আরাম করুন। রুদ্রদদ্দরবাবু চান-টান করো। খাওয়া-দাওয়া করো।

—তারপরই বললেন, আজ কি খাবে ?

—যা খুশি।

—পেট একদম ঠিক ত' ?

—একদম ঠিক।

—একদম ঠিক ?

তাহলে কেমন ঠিকা, তা পরীক্ষা করার জন্যে একটা স্পেশ্যাল রান্না খাওয়াব।

কি রান্না ?

সর্ষে-মুরগী।

সর্ষে-মুরগী ?

হ্যাঁ। তোমরা বাঙালীরা জোর সর্ষে-বাটা কাঁচালংকা দিয়ে ইলিশ মাছ, অথবা অন্য মাছ, যেমন আড় বা বোয়াল বা কই মাছ খাও, তেমন করেই আমরা সর্ষে-মুরগী খাই।

ঋজুদা বলল, আমি কিন্তু খেয়েছি।

কোথায় ? বিষেণদেওবাবু শুধোলেন।

ঋজুদা আমার দিকে চেয়ে বলল, সত্যি রে। রিণা, মানে অপর্ণা সেনের বাড়িতে। নিজে-হাতে রেঁধেছিল। ফারস্ট ক্লাস

তারপর বলল, ওর হাতের রান্না চমৎকার। ভাল রান্না করতে পারা যে মেয়েদের কত বড় গুণ।

আমি বললাম, যাই-ই বলো তুমি, কমলুদির মত কেউই রাঁধতে পারে না। যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনি রাঁধে।

—কে কমলুদি ? ঋজুদা হেসে জিজ্ঞেস করল।

তারপর বলল, সুন্দর দেখতে হলেই ভাল রাঁধবে ?

আমি বললাম, আরে কমলুদি। লীলা দীদার মেয়ে ; মনীষীদার স্ত্রী।

ঋজুদা পাইপের ধুঁয়ো ছেড়ে অন্যমনস্ক গলায় বলল, ওঃ, তাই-ই বুঝি। তা না-খাওয়ালে আর কি করে জানবো বল। মনীষী আর কমলুকে বলিস এই খাদ্য-রসিককে নেমন্তন্ন করতে একদিন।

নিশ্চয়ই বলব। কমলুদি ত' রান্নার বইও লেখে, লীলা দীদার সঙ্গে—তাতে কি সব ভাল ভাল রান্না যে আছে না ?...

বিষেণবাবু বললেন, এ রকমই হয়। কলেরা কি ডিসেন্ট্রী থেকে ভাল হয়ে উঠলে মানুষ খুব পেটুক হয়ে যায়। জিভে জল আসছে, না রুদ্রদদ্দরবাবু ?

—বলেই, উঠে চলে গেলেন।

এ্যাইসা রাগ হলো আমার !

ভানুপ্রতাপ আগেই গেছিলেন। দুজনেই ডিনার টাইমের আগেই আসবেন বলে গেছেন।

ঋজুদা বলল, দেখলি ত' বিষেণদেওবাবু তোকে পেটুক বললেন। পেটুক আর খাদ্য-রসিকের মধ্যে তফাতটা আর ক'জন বোঝে বল ? পেটুক হলো, আ বিলিভার ইন্ কোয়ানটিটি। আর রসিক হচ্ছে, আ বিলিভার ইন্ কোয়ালিটি।

আমি বললাম, জেঠুমণি কি যেন একটা কথা বলতেন ঋজুদা ?

বলতেন দ্যা ওন্‌লি ওয়ে টু দ্যা হার্ট ইজ থ্রু দ্যা স্টম্যাক্। অর্থাৎ, কারো হৃদয় জয় করতে চাইলে তাকে ভাল করে খাওয়াও। হৃদয়ে পৌঁছনোর সবচেয়ে শর্টকাট রাস্তা হচ্ছে পেটের ভিতর দিয়ে।

আমি বললাম, বিষেণবাবুরা বোধহয়—ঐভাবেই আমাদের হৃদয় জয় করবেন ঠিক করেছেন।

ঋজুদা আমার কথার উত্তর না-দিয়ে হঠাৎ হাততালি দিল। একজন বেয়ারা এল।

ব্রিজনন্দনজী কাঁহা ? ঋজুদা শুধোল।

উনি ত' বিকেলের বাসেই হাজারীবাগ চলে গেছেন। সেখান থেকে সারিয়া গিয়ে বেনারসের ট্রেন ধরবেন।

—আজই চলে গেছেন ? ঋজুদার গলায় উদ্বেগের সুর লাগল।

—এই ত' ! খোকাবাবুকো গাড়ী ঘুষা, ঔর উনোনে ভি নিক্‌লা, একদম্ সাথ্‌হি সাথ্। কাহে ? আপলোগ দেখা নেহি ?

নেহি ত' ! ঋজুদা বলল।

বেয়ারা চলে গেলেই ঋজুদা বলল, রুদ্র, তোর ঘরে চল্ তাড়াতাড়ি—খবর বল্ সব।

ঘরে ঢুকেই ঋজুদাকে সব খবর বলতে যাচ্ছিলাম।

ঋজুদা বলল, এখানে নয় ; বাথরুমে চল। বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাথটাবের জল জোরে খুলে দিয়ে সব শুনল।

তারপর বাথরুম থেকে বেরিয়ে, ঘরের দরজা বন্ধ করতে বলল আমাকে।

বলেই কাঁচিটা বের করে যে লাল-রঙা ভিজে-কম্বলে-মোড়া মোরাদাবাদী কুঁজো থেকে জল ঢেলে দিয়েছিলেন বিষেণদেওবাবু, সেই বিরাট কুঁজোর উপরের লাল-দামী কম্বল কাঁচি দিয়ে গোল করে কেটে ফেলল। কেটে ফেলার পরই কুঁজোটার মধ্যে একটা জোড়া দেখা গেল। জোড়-এর প্যাঁচ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে খুলতেই কুঁজোটা দু'ভাগ হয়ে গেল। দেখা গেল, জল আছে নীচের ভাগে। আর নীচের ভাগের সঙ্গে একটা নল এসে পড়েছে উপরের ভাগের মুখে ; যাতে কুঁজো কাৎ করলেই জল পড়ে। কিন্তু ঐ নলের চারপাশে গোল করে সাজানো তিনটে টেপ-রেকর্ডার। এমন ছোট ছোট ব্যাটারী-চালিত ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস রয়েছে তাতে যে, একটার ক্যাসেট রেকর্ডিং শেষ হলেই অন্যটার রেকর্ডিং শুরু হবে। কুঁজোর উপরের ভাগটাতে ঝাঁঝরির মত অসংখ্য ফুটো করা।

ঋজুদা বলল, তোর কাছে কি কি ক্যাসেট আছে ?

বলেইছি ত'। দ্যা পোলিস্, বী-জীস্, আর কিছু বনি-এম্ আর আব্বা গ্রুপের পুরনো গান—। জ্যাক লেনন্‌ও আছে।

হুঁ। আমার কাছে আছে গিরিজা দেবী, রামকুমার চট্টোপাধ্যায় আর মালতী ঘোষাল।

তারপরই বলল, এক কাজ কর। তুই টর্চটা ধর, আমি ক্যাসেটগুলো পাল্টে দিচ্ছি। ব্যাটাদের রুচি ভাল করে দিয়ে যাব আমরা।

আমি বললাম, এ তোমার কেমন নেমন্তন্ন আসা হে, তোমার ঘর বাগিং করে রেখেছে ?

ঋজুদা ক্যাসেট চেঞ্জ করতে করতে বলল, "কার্য হলেই কারণ থাকে, একটা কিংবা অনেকগুলো"—

আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে, এখন লাল ভেজা কম্বলটা সেলাই করি কি করে ?

ঋজুদা বলল, এ্যারালডাইট নয়, অন্য একটা সল্যুসানের টিউব আছে, নীল-রঙা। বের কর আমার ব্যাগ থেকে। একদম কথা বলবি না এখন থেকে আর। বললেই তোর ঠোঁট দুটোই সীল্ করে দেবো।

কাটা-কম্বল সেলাই প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় বারান্দায় যেন কার পায়ের শব্দ শোনা গেল।

শব্দ শোনামাত্রই আমরা দুজন বডি থ্রো দিয়ে বিছানায়।

—কওন ? ঋজুদা বলল।

ম্যায় বেয়ারা হুজৌর।

গলার স্বরটা অচেনা লাগল।

ক্যা বাত্ হ্যায় ? ঋজুদা বলল।

রাজাসাব আপলোগোঁকা লিয়ে একঠো খাত্ ভেজিন।

খাত্ ? বলে, ঋজুদা দরজা খুলতেই, বিকটদর্শন লোকটাকে দেখা গেল। সঙ্গে আরো দুজন গুণ্ডা মত লোক।

বাধা দেবার আগেই ওরা দুজনে মিলে ঋজুদাকে মুখ-ঠেসে জড়িয়ে ধরল। একজন তাড়াতাড়ি মোটা দড়ি বের করে বেঁধেও ফেলল। পিছ-মোড়া করে।

তারপর তিনজনই দমাদ্দম্ কিল-চড়-লাথি মারতে লাগল—ঋজুদার বুকে-পেটে-মুখে। বলল, নমকহারাম !

ঋজুদা মুখটা ভেটকিমাছের মত করে বলল, উঃ লাগছে।

—লাগবে।

ওদের মধ্যে একজন বলল। লাগাবার জন্যেই ত' এই হরকৎ।

ঋজুদা আবার বলল, লাগছে-এ।

ওরা একসঙ্গে বলল, লাগাতার।

অনেকটা কোলকাতার পথের মিছিলের চলছে চলবের মত শোনাল ব্যাপারটা।

ওরা বলল, যারা নমক খেয়ে গুণ না গায়, উল্টে নমক-হারামী করে তাদের এই-ই শিক্ষা। এটা মুলিমালোয়াঁ। আপনাদের কোলকাত্তা নয়। এখানে আপনাদের পুঁতে দিলেও কেউই জানতে পারবে না, কোথায় হারিয়ে গেলেন আপনারা। অনেক লোক এর আগে হারিয়ে গেছে এখানে থেকে।

আমার ভয় করছিল। কিন্তু খুবই আশ্চর্যের কথা, বারবার দেখেছি, ভয় যখন পাওয়ার ঠিক তখন না পেয়ে, আমার একটু পরে যায়।

আমি লোকগুলো আর ঋজুদার দিকে চোখ রেখে খুবই ভয়-পাওয়া মুখ করে খোলা দরজার দিকে যেতে লাগলাম।

গিরধারী না কে, সে বলল, এ বাঁচ্চো চুপ-চাপ্ অন্দরমে রহো, নেহি ত' আভি ধড়কা দেগা।

বলেই কোমর থেকে তুলে একটা এক-হাত লম্বা ঝকঝকে ছুরি দেখালো।

তিনটে লোকই তখন আমার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল। দেখলাম, ঋজুদা পিছমোড়া অবস্থাতেই, আস্তে আস্তে নীচের কার্পেটে পড়ে-থাকা কাঁচিটার দিকে এগোচ্ছে। আমার ভয় হল, ঋজুদার কোমর থেকে যদি পিস্তলটা ওরা খুলে নিয়ে নেয়, তাহলে ?

হঠাৎ এ-বি বাবুর দেওয়া নতুন পিস্তলের কথা মনে হল আমার। এক মুহূর্তের মধ্যে পিস্তলটা কোমর থেকে তুলে নিয়েই দু' হাত লাগিয়ে কক্ করলাম। ম্যাগাজিন ভরাই ছিল। পিস্তলটা কক্ করার শব্দ হতেই ওরা ভয়ের চোখে আমার দিকে তাকাল।

আমি ওদের বুকের দিকে পিস্তলের নল ধরে বললাম, হাত উপার, একদম্ উপার ! তিনো আদ্‌মী !

ওরা সকলেই হতভম্ব হয়ে গেছিল। আমাকে নিতান্তই নিরামিষ ছেলেমানুষ বলে ঠাউরেছিল ওরা।

আগুনের ভাঁটার মত চোখে দেখছিল সকলেই আমার দিকে।

হঠাৎ ঋজুদা একলাফে আমার দিকে চলে এসেই আমার পিছনে দাঁড়াল।

আমাকে বলল, ওদের বাথরুমে পুরে দিয়ে বাইরে থেকে হুড়কো লাগিয়ে আমার হাতের দড়িটা খুলে দে রুদ্র। শিগগিরি !

আমি ঋজুদার দিকে চেয়ে দেখলাম, মুখের কষ বেয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। দরজার কাছে গিয়ে ওদের তিনজনকে ভেড়ার পালের মত তাড়িয়ে নিয়ে বাথরুমের মধ্যে ঢোকালাম আমি। ঢুকিয়েই হুড়কো টেনে দিলাম।

হাতের বাঁধন কাটা হতেই, ঋজুদা নিজের পিস্তলটা বের করে নিয়ে বাথরুমের দরজা খুলল। একটা লোক বাথরুমের খোলা জানালা দিয়ে বাইরে লাফাবার উপক্রম করছিল, ঋজুদা তার কাছা ধরে টান দিতেই তার ধুতি খুলে গেল। কেলেঙ্কারী অবস্থা !

ঋজুদা বলল, তোমরা কার লোক ? এখুনি বলো। নইলে গুলিতে খুপরি উড়ে যাবে। আন্ডু-কাটা ছুরি নিয়ে এসেছো, আমার চেলার সঙ্গে টক্কর দিতে। বল, তোমরা কার

লোক ?

আমাদের যে-কটা রুমাল ছিল সবকটাকে ভালো করে প্রত্যেকের মুখ-হাঁ করিয়ে গোল করে পাকিয়ে টাগরা অবধি ঢুকিয়ে দেওয়া হল। তারপর প্রত্যেককে কচ্ছপের মত উপুড় করে দু'হাত-দু'পা কোলকাতা থেকে নিয়ে আসা নাইলনের দড়ি দিয়ে টাইট করে বেঁধে, দুজনকে বাথরুমের জলভর্তি বাথটাবে আর একজনকে কমোডের মধ্যে মুখ করে ফেলে দিলাম আমরা। বাথরুমের দরজা জানালা বন্ধ করে বাথরুমের দরজায় বাইরে থেকে আমাদের নিজেদের তালা লাগিয়ে ঋজুদা বলল, চল্ এবার। অনেক কাজ আছে।

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরুবার আগে আমাদের যে-দুটো চামড়ার ব্যাগ সবসময় কাঁধে থাকে, বিশেষ বিশেষ সময়ে, সেই ব্যাগ দুটো তুলে নিয়ে আমরা আমাদের নিজেদের আনা তালা দিয়ে ঘরের বাইরে থেকে তালা ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

নীচে নেমেই, ঋজুদা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করল, গাড়ি কোথায় ?

বললাম, গ্যারাজে। তারপর বললাম, তোমার রক্ত পড়া থেমে গেছে ?

ঋজুদা বলল, এখন অবান্তর কথা বলার সময় নেই। তাড়াতাড়ি কর।

গ্যারাজের দিকে যেতে যেতে বলল, তেল কত আছে ?

আমি বললাম, হাফ-ট্যাঙ্ক।

ঋজুদার ফিয়াটের পাশেই ভানুপ্রতাপবাবুর সাদা-রঙা পেট্রল-মার্সিডিসটা দাঁড়িয়েছিল। তাড়াতাড়ি সাইফনিং-এর পাইপ বের করে ঐ গাড়ি থেকে আমাদের গাড়ির ট্যাঙ্ক ফুল করে নিলাম। গ্যারাজে একটা কালো, ধূলি-ধূসরিত এ্যাম্বাসাডর গাড়ি দেখলাম। ঋজুদা বলল, নম্বরটা লিখে নিতে। এটা এ বাড়ির গাড়ি নয়। আজই এসেছে। কোথা থেকে এল ?

তারপর বলল, ডিকি থেকে টোয়িং-রোপ, বাক্স সব পিছনের সীটে এনে রাখ্। তাড়াতাড়ি। সময় নেই। ট্রান্সমিটারটা ?

বললাম, সব আছে।

গাড়ি স্টার্ট করেই, আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

বিরাট গেটের দু' দিকে যে দুজন দারোয়ান থাকে, তারা বেরিয়ে এল। ওদের দুজনের হাতেই বন্দুক।

ওরা বলল, রাজাসাহেব আর ভানুপ্রতাপজী আপনাদের রাতের বেলা মহুল থেকে বেরোতে একেবারেই মানা করে গেছেন।

ঋজুদা হাসল। বলল, আমরা জঙ্গলেরই চিড়ীয়া।

হেসেই, পাইপের তামাক বের করল পাউচ থেকে। বের করে বলল, বিলাইতী খৈনী, ইধার্ আও।

নেহী হুজৌর।

আরে, লাও। ডাট্‌কে পিষ্‌কে, ঠোঁটোয়াকা নীচে জারাসে দাব্ দেও ; ঔর ফ্রিফ্ দিখো কিত্‌না মজা আতা হ্যায়।

বলেই, বলল, রাজাসাব আর ভানুপ্রতাপজীই আমাদের বলে গেছেন ওঁরা যেখানে গেছেন সেখানেই যেতে। কোন্‌দিকে গেল ওঁদের গাড়ি ?

লোকদুটো সরল। বলল, রাজাসাহেব গেলেন গীমারিয়ার দিকে আর ভানুপ্রতাপজী লুলিটাওয়ার দিকে।

বহুত্ মেহেরবানী।

বলেই, ঋজুদা গাড়িটাকে এক দমকে বাইরে আনল।

ফুট-ফুট করছে জ্যোৎস্না নির্মেঘ আকাশে। ছাউ-রঙা ফিয়াট গাড়িটা চাঁদের আলোর সঙ্গে একেবারে মিশে গেছে। ঋজুদা গাড়ির হেডলাইট, এমনকি সাইড লাইটও না জ্বেলে খুব আস্তে আস্তে লুলিটাওয়ার দিকে চলেছে। ছোট ছোট চড়াই উতরাইয়ে রাস্তা। উতরাইয়ে এঞ্জিন বন্ধ করে নামছে—আর চড়াই আসার আগেই গাড়ি গীয়ারে রেখে হঠাৎ চাবি ঘুরিয়ে স্টার্ট করছে যাতে কম শব্দ হয়।

সেদিন টুটিলাওয়ার হাজীসাহেবের কাছ থেকে শরবত খেয়ে আসার পথে আমরা যে পথে ডানদিকে ঢুকেছিলাম, সেই পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে ঋজুদা বলল, রুদ্র, দেখ ত', কোনো গাড়ির চাকার দাগ আছে কি না এ পথে ঢোকার—টাট্‌কা।

আমি নেমে পড়ে, পিছন ফিরে বসে, যাতে টর্চের আলো বেশীদূর না যায়, এমনভাবে দেখে নিয়ে বললাম, হ্যাঁ আছে। জীপের চাকার দাগ।

ঋজুদা বলল, হুম্‌মম্।

আমি বললাম, কিন্তু কেন ? সাপটা ?

হঠাৎ ঋজুদা নিজের মনেই বলল, নাঃ এখানে সময় লাগবে আমাদের অনেক। চল্ আগে, অ্যাল্‌বিনোটাকে দেখে আসি।

বলে, ঐ ভাবেই গাড়ি ঘুরিয়ে, বাতি নিবিয়ে চলতে লাগল। মালোয়া-মহলের আগের চড়াইটাতে জোরে উঠেই এঞ্জিন বন্ধ করে এমনভাবে চুপচাপ, নিঃশব্দে গাড়িটাকে মালোয়া-মহলের গেটের পাশ দিয়ে গীমারিয়ার দিকে নিয়ে গেল যে, এ্যাম্বোরা তামাকের খৈনীর নেশাতে বুঁদ দারোয়ানদের তা নজরে এলো না।

মালোয়া-মহল থেকে বেশ কিছুটা এসে আমরা সেদিন বিকেলে যেখানে বাঘের পায়ের ছাপ দেখেছিলাম পিস্‌কি নদীর উপর, সেই পথের মোড়টা ছাড়িয়ে গিয়ে ঋজুদা বড় রাস্তাতেই গাড়িটা রাখল।

তারপরই ঋজুদা, জঙ্গলে ঢুকে পড়ল আমাকে নিয়ে। যত কম শব্দ করে গাড়ি লক্ করা সম্ভব তাই-ই করলাম।

টর্চ আছে, কিন্তু জ্বালাচ্ছি না। পিস্তলের হোল্‌স্টার খোলা। যে-কোনো মুহূর্তে হাতে নিতে পারি। ঋজুদা যে কী পাগলের মত করছে, কেন করছে, কিছুই বলছে না। ঠিক এমন সময় অ্যাল্‌বিনোটা ডাকল নদীর দিক থেকে। আজকে শেষ বিকেলে ডেকেছিলো কি-না মনে নেই। আমরা শুনিনি। আজ এত দেরি করে ?

জঙ্গলের মধ্যে চাঁদনী রাতে, যারা অভ্যস্ত তাদের পক্ষে হাঁটা কিছুই নয়। অন্ধকারেও নয়। শহুরের লোকেরা পায়ের পাতা আগে ফেলে তারপর পথের উপর পা পাতেন। কিন্তু জঙ্গলে গোড়ালি আগে পেতে তারপর পাতা পাতলে সুবিধা হয়। এই কারণেই সমস্ত আদিবাসী ও জঙ্গলের মধ্যে যে সব মানুষ থাকে তাদের গোড়ালির কাছটা অসম্ভব সাদা দেখায়। খালি পায়ে হাঁটে এবং ঐভাবে হাঁটে বলেই ওরকম হয়। কিন্তু দৌড়বার সময় তা বলে ওরা কেউই ফ্ল্যাট-ফুটেড্ নয়। চমৎকার দৌড়য়, মনে হয় উড়েই যাচ্ছে যেন।

ঋজুদা অ্যাল্‌বিনোর ডাকই অনুসরণ করে পাগলের মত চলেছে খানায় পড়ে, কাঁটায় ছড়ে। আমরা বেশ কিছুদূর গেছি। আন্দাজে বুঝতে পারছি যে, ঋজুদা নদীটার দিকেই যাওয়ার চেষ্টা করছে জঙ্গলের ভিতরে ভিতরে।

আবার বাঘের ডাক শুনলাম আমরা। এবার বেশ কাছ থেকে। অ্যাল্‌বিনোটা। আমি চমকে উঠলাম। একটু ভয়ও পেলাম। পয়েন্ট টু-টু পিস্তল হাতে রাতের বনে, পায়ে

হেঁটে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মুখোমুখি হওয়াটা আমার কাছে সুখের ব্যাপার নয়। ঋজুদার কাছে হলেও হতে পারে।

বাঘটা আবারও ডাকল। বারবার ডেকেই চলল। বাঘটা এদিকে ওদিকে ঘুরে ঘুরে ডাকতে লাগল। খুবই কাছ থেকে। এখানে আসার পর প্রায় সন্ধেতেই ডাক শুনেছি এর। কিন্তু এমন ভাবে, এত কাছের থেকে নয়।

আমার ভয় বাড়তে লাগল।

ঋজুদা ফিস্ ফিস্ করে বলতে লাগল, ভেরী ইন্টারেস্টিং!

আমি তাতে আরও ভয় পেয়ে গেলাম। ভাবলাম, বাঘে আমাকে খেয়ে নিলে ঋজুদা বাঘকেই হয়ত বলবে, হাউ নাইস অফ্ উ। ভেরী ইন্টারেস্টিং।

ঋজুদা এবার হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল—কিছুদূরেই নদীর সাদা বালির বুক দেখা যাচ্ছিল—তারই মধ্যে একজন লোক ঘুরে বেড়াচ্ছিল মনে হল। চাঁদনী রাতে সাদা বালির চরে, তার মূর্তিকে ভূতুড়ে বলে মনে হচ্ছিল। আর বাঘটা ডেকেই যাচ্ছিল। লোকটার একেবারে কাছ থেকেই।

ঋজুদা তাড়াতাড়ি হামাগুড়ি দিয়ে পিছিয়ে এল। অনেকখানি। প্রায় দু' ফার্লং।

তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, রুদ্র, ভালো করে শোন্।

বেচারা ঋজুদা! আফ্রিকাতে ভুতুড়ার গুলি-খাওয়া পাটা এখনও ঠিক হয়নি। কিরকম হাঁপাচ্ছে। পায়ে ব্যথাও নিশ্চয়ই করছে।

ঋজুদা বলল, তুই এইখানে একটা গাছে উঠে বসে থাক্। ঐ লোকটা, যে-রাস্তা দিয়ে এসেছে, সেই রাস্তা দিয়েই ফিরে যাবে। লোকটা তোর কাছ দিয়েই যাবে ডানদিকে, ঐ ত' পথটা দেখা যাচ্ছে। লোকটার কিরকম পোশাক? কেমন হাঁটার ধরন! সব লক্ষ্য করবি। লোকটাকে এই চাঁদের আলোতেও হয়ত চিনতে পারবি তুই। হয়ত কেন? আমার মনে হয়, নিশ্চয়ই পারবি। তারপর লোকটা চলে যাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর, তুই আস্তে আস্তে হেঁটে ঐ রাস্তা ধরেই বড় রাস্তার মোড়ের দিকে আসবি—যেখানে গাড়ি ঢুকিয়ে ছিলাম আমরা। আমি গাড়ি নিয়ে গীমারিয়ার দিকে গিয়ে লুকিয়ে থাকব। লোকটা চলে যাওয়ার পর তুই হেঁটে আসবি গাড়ির কাছে। বুঝেছিস?

আমি বললাম, হুঁ।

তারপর বলল, ও, তোকে ত' আসল কথাটাই বলা হয়নি। লোকটা দূরে চলে গেলেই—তুই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নদীতে যাবি। লোকটা যেখানে ঘোরাঘুরি করছিল ঠিক সেইখানেই ভাল করে খুঁজবি।

—কি? অ্যালবিনো? বলতে পারলাম না আর, যে, টু-টু পিস্তল নিয়ে?

আমার গলায় থুথু আটকে গেল।

ইডিয়ট্। ঋজুদা চাপা গলায় বলল।

—তারপর বলল, অ্যালবিনো নয়, একটা টেপ-রেকর্ডার পাবি। হয়ত কোনো ঝোপের আড়ালে, কী পাতার মধ্যে, কী কোনো শুকনো নালার মধ্যে লুকিয়ে রাখবে ও—যেখানে সকলের অলক্ষ্যে দিনের বেলাতেও গিয়ে রেকর্ডারের প্লেয়ারের সুইচ টিপে দেওয়া যায়। ওটাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

—যদি পাই? ত' নিয়ে আসব?

—না। রেকর্ডারটা আনবি না। ক্যাসেটটাই শুধু চেঞ্জ করে দিবি। ঐ ক্যাসেটটা বের করে—তোর কাছে যদি কোনো ক্যাসেট থাকে—দ্যাখ্ তোর ব্যাগে—তাহলে চেঞ্জ

করবি। নইলে, রেকর্ডারটাকে ঐ ভাবেই ফেলে রেখে ওর ভেতরের ক্যাসেটটা নিয়ে আসবি। ক্যাসেটটা আমার চাইই।

বলেই, বলল, আর সময় নেই। গুড লাক্। বর্ষাকাল, সাপ-কোপের ঘাড়ে পা দিস্ না। সাবধানে।

বলেই, ঋজুদা জঙ্গলের নীচের আলো-ছায়ার বুটি-কাটা গালচের মধ্যে হারিয়ে গেল।

আমি এবার একটা গাছ খুঁজলাম—যাতে পাতা বেশী, পিঁপড়ে কম, সাপের ফোকর নেই। কিন্তু তেমন গাছ ত' মেলা মুশকিল। অন্ধকারে বুঝতেও পারলাম না কি গাছ। চড়ার পর মনে হল, শিশু। গোলগোল পাতা। বসে, একেবারেই আরাম নেই; বড়ই শক্ত কাঠ।

একটা গ্রেইন-ফিভার পাখি ডাকছে আমার দিক থেকে। নদীর উল্টোদিক থেকে তার সাথী সাড়া দিচ্ছে। একটা একলা টিটি পাখি পিস্‌কি নদীর শুকনো সাদা বালিতে ছায়ার মত নড়ে বেড়ানো লোকটার মাথার উপরে ঘুরে-ঘুরে লম্বা লম্বা ঠ্যাং দুটো দুলিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। ভালই হয়েছে। পাখিটা ঐ লোকটার সঙ্গ ছাড়বে না। ঠিক তার মাথার উপর উড়তে উড়তে আসবেই। তার চলাচল বোঝার কোনো অসুবিধেই হবে না আমার।

একটা ঢাব পাখি হঠাৎ ডাকতে লাগল রাস্তার ওপার থেকে। ঢাব্-ঢাব্-ঢাব্-ঢাব্-ঢাব্ করে ডেকেই চলবে। বাঘটা এখন আর ডাকছে না। অত কাছ থেকে প্রায় নিরস্ত্র অবস্থায় বাঘের ডাক শুনতে ইচ্ছেও নেই। রবার্ট কেনেডির মাথা আর বাঘের মাথা ত' এক জিনিস নয়—এ-বি বাবু যাইই বলুন না কেন। একটা খাপু পাখি ডাকছে আরও দূর থেকে খাপু-খাপু-খাপু-খাপু-খাপু—। সারারাত চাঁদ-ওড়া বনে ও ডেকে যাবে এমনি করেই। মাঝে মাঝে ময়ূর ডাকবে কেঁয়া কেঁয়া কেঁয়া করে বুকের মধ্যে চমক তুলে।

প্রায় মিনিট পনেরো পরে টিটি পাখিটা পাইলটিং করে লোকটাকে নিয়ে আসতে লাগল—তার মাথার উপর ঘুরে ঘুরে উড়ে। লোকটা কাছে আসছে; এসে গেল। তার নাগরা জুতোর লোহার নাল পথের কাঁকড়ের উপর খচর মচর আওয়াজ করছে।

—কে? ব্রিজনন্দন?

হ্যাঁ। তাইই ত'! অবাক হয়ে আমি চেয়ে রইলাম। সেই ধুতি, গোলাপি টেরিলিনের পাঞ্জাবী—এখন সাদা দেখাচ্ছে চাঁদের আলোতে। ব্রিজনন্দনের পাঞ্জাবীর তলায় পিস্তল আছে—আমি জানি। থাকুক। আমারও আছে এখন।

ও চলে গেলে, আমি গাছ থেকে নেমে নদীর দিকে এগিয়ে গেলাম আস্তে আস্তে। নদীতে নেমে পড়লাম। একদল চিতল হরিণ নদীতে জল খেতে আসছিল, আমাকে দেখতে পেয়েই, চাঁদের আলোয়, বনের ছায়ার দুধলি অন্ধকারে তারা এমন বড় বড় লাফে দৌড়ে পালাল, যেন মনে হল উড়েই যাচ্ছে—আফ্রিকান গ্যাজেল্‌দের মত। টঙি-টঙি-টঙি করে পুরুষ হরিণগুলো বনের সব প্রাণীদের আমার আসার কথা জানান্ দিয়ে সাবধান করে দিয়ে ডেকে উঠল, রাতের ঝিম্‌ঝিমে নিস্তব্ধতা ছিঁড়েখুঁড়ে।

ভাল করে খুঁজতে লাগলাম ঘুরে ঘুরে নদীটার সমান্তরালে একটা খোয়াই চলে গেছে। তার মধ্যে বড় বড় ঘাস—চওড়া-চওড়া তাদের ফলা। পাতার কোণে খুব ধার—ওর মধ্যে নেমে দেখতে গিয়ে আমার হাতই কেটে যেতে লাগল। কিন্তু একটু পরেই পাওয়া গেল। টেপ-রেকর্ডারটা। চট্ করে ক্যাসেটটা খুলে নিয়ে আমি আমার ব্যাগ থেকে বের-করা ক্যাসেটটা পুরে দিলাম। এর মধ্যে কোন্ গান আছে কে জানে—টর্চ না জ্বালালে জানবারও উপায় নেই। টর্চ জ্বালবার অর্ডারও নেই।

কাজ শেষ করে জঙ্গলে কিছুটা ফিরে এসে আমি এবার পথে উঠলাম।

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে বিকট বুক কাঁপানো আওয়াজ তুলে একটা হায়না হেসে উঠল নদীর ওপার থেকে। কাকে ঠাট্টা করছে ও, ওই-ই জানে। হয়ত নিজেকেই। কিন্তু রাতের জঙ্গলে হায়নার ডাক গায়ের লোম খাড়া করে দেয়। আমাদের দেশের হায়নারা আফ্রিকান হায়নার চেয়ে অনেক বড় হয়—অনেক সময়, যে এই ডাক চেনে না, সে রাতের জঙ্গলে দূর থেকে কোনো ভৌতিক শব্দ বলে ভুলও করতে পারে। হায়নার ডাক শুনলেই গা ছম্‌ছম্ করে ওঠে আমার।

আমি বড় রাস্তাতে এসে উঠতেই ঋজুদার গাড়িটা ভুতুড়ে গাড়ির মত গড়িয়ে এল আমার কাছে। এঞ্জিন বন্ধ করে।

ঋজুদা বলল, কিরে? চিনতে পারলি?

আমি ফিস্‌ফিস্ করে বললাম, ব্রিজনন্দন!

ঋজুদা বলল, অনুমান তাই-ই করেছিলাম। কিন্তু ও এই পথেই গেছে, চল্ আমরা বরং ওল্ড রাত্‌রা রোড হয়ে মালোয়াঁ-মহলকে বাইপাস্ করে বেরিয়ে যাই। শোন্, পিস্তলে যখন গুলি ছুঁড়বি, হাতটাকে কাঁধের কাছ থেকে শক্ত করবি। আঙুলগুলো আর হাতের পাতাটা আলগা করে ধরে থাকবে পিস্তলকে। সমান প্রেসারে ট্রিগার টানবি। আর সবসময় টার্গেটের সিক্স-ও-ক্লকে এইম্ করবি। কারণ, পিস্তল-এর মাজল্-এর গুলি বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে ওঠার টেনডেন্সী থাকে। পরে, অনেক ছুঁড়তে ছুঁড়তে এইম্ করারও আর দরকার হবে না। তুলবি আর মারবি।

ওয়েস্টার্ন ছবির হিরোদের মত? আমি বললাম।

হ্যাঁ। ওরা ত' ছবিরই হীরো। এখন তুই এই হাজারীবাগী জঙ্গলের জেনুইন হীরো। খুবই এ্যালার্ট থাকবি। কোনো কিছু গণ্ডগোল দেখলেই গুলি চালাতে এক সেকেন্ড দেরি করবি না—আমার পারমিশান্ নেওয়ারও দরকার নেই। তবে......

বলে, নিজের পিস্তলটা বের করে, ব্যাগ খুলে কি একটা লোহার নলের মত জিনিস ঋজুদা তার নিজের পিস্তলের নলের মুখে পরিয়ে নিল।

বললাম, এটা কি?

সাইলেন্সার।

গুলি করলেও, শুধু ব্লপ্ করে একটা চাপা আওয়াজ হবে। দশ গজ দূরের লোকও শুনতে পাবে না যে, থ্রি-সেভেনটিন্-এর গুলি কারো মগজ বা বুক ফাঁক করে দিল। এর জন্যে স্পেশ্যাল লাইসেন্স্ লাগে। আমাকে দিয়েছেন ওয়েস্ট-বেঙ্গল গভর্নমেন্টের হোম-ডিপার্টমেন্ট—ভেরী কাইন্ড অফ্ দেম্।

ঋজুদা বলল, ট্রান্সমিটারটা বের কর্ শীগগিরী।

তাড়াতাড়ি বের করলাম সেটাকে টেনে। একটা ছ' ভোল্টের ব্যাটারীর মত জিনিস। তবে ওজন অনেক কম।

এরীয়ালটা তুলে দিয়ে ঋজুদা বলল, পাসওয়ার্ড কি দিয়েছেন?

আমি বললাম, এ্যাই রে। দাঁড়াও মনে করি। হ্যাঁ। গুল্‌লি-ওলি।

ট্রান্সমিটারে নানারকম শব্দ হতে লাগল।

ওপাশ থেকে ভেসে এল গুল্‌লি-ওলি। রজার।

ঋজুদা বলল, কাম টু ডাল্গিং হল এ্যাট টুয়েন্টিওয়ান আওয়ার শার্প। সারাউন্ড ইট কমপ্লিট্‌লী উইথ ফোর্স্। এপ্রিহেন্ড স্টং রেজিস্ট্যান্স্। এনিমী ওয়েল-আর্মড্। ওভার।

ওপাশ থেকে ভেসে এল, গুল্‌লি-ওলি—রজার ওভার।

ঋজুদা বলল গুল্‌লি-ওলি। আই রীপিট্। বলে আবার মেসেজটা রীপিট্ করল ঋজুদা।

ওপাশ থেকে বলল, রজার। উই আর রেডী। এণ্ড মুভিং আউট্। ওভার।

থ্যাংক্স্। ওভার।

হল। বলল, ঋজুদা। তারপর গাড়ি স্টার্ট করল।

বলল, ক'টা বাজল রে রুদ্র?

আমি ঘড়ির রেডিয়ামে তাকিয়ে বললাম, সাতটা দশ। ঋজুদা বলল, ফাইন্। উই উইল আর্ট বী আ লিটল এ্যাহেড্ অফ রাঁদেভু টাইম।

তারপর বলল, ট্রান্সমিটারটা এই পথের মোড়েই জঙ্গলের মধ্যে এমনভাবে লুকিয়ে রাখ যাতে কাল সকালে খুঁজে পেতে অসুবিধা না হয়।

আমি বললাম, কেন? গাড়িতেই থাকুক না।

ঋজুদা বলল, যা বলছি, তাইই কর।

গাড়ি থেকে নেমে একটা কেলাউন্দা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখলাম ওটাকে।

ওল্ড রাত্‌রা রোড হয়ে আমরা সেই সাপের আক্রমণের রাস্তায় গিয়ে পৌঁছলাম। রাস্তাটা ছায়াচ্ছন্নতার জন্যে দিনের বেলাতেই এত অন্ধকার যে, রাতের বেলা আলো না জ্বেলে চলাই মুশকিল।

ঋজুদা বলল, এখন শুধুই সাইড-লাইট জ্বালাচ্ছি। তুই কোনো গাড়ির চাকার দাগ দেখতে পাস কি-না দ্যাখ ত' ভালো করে। যতদূর চাকার দাগ পাওয়া যাবে—আমরা সেফলি গাড়ি নিয়ে ততদূর যেতে পারব।

আমি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে দেখতে বললাম, পাচ্ছি না। পেলেই তোমাকে বলব। এত অন্ধকার যে সাইড-লাইটে কিছু দেখাই যাচ্ছে না।

খুব আস্তে আস্তে গাড়িটা চলছে—আমরা প্রায় মাইল তিনেক এসে গেছি; এমন সময় ঋজুদা গাড়িটা থামিয়ে দিল। এঞ্জিনও বন্ধ করে দিল।

বলল, দেখেছিস্ কী ধুরন্ধর এরা!

বলেই বলল, গাড়িতে যা জিনিস-পত্র আছে, তার যা-কিছু পারিস সবই ব্যাগে পুরে নে। আর গদাধরের বাক্সতেও যা দরকারী জিনিস আছে, তাও নিয়ে নে নিজেদের ব্যাগে।

যতখানি আঁটল দুজনের ব্যাগে পুরলাম। তারপর বললাম, এবার কি?

ঋজুদা বলল, সামনে, রাস্তায় শুকনো পাতার উপরে কিছু কাঁচা পাতা দেখতে পাচ্ছিস? কিছু বিসাদৃশ্য?

হ্যাঁ।

ঐখানে একটা গর্ত করে রেখেছে ওরা। ঐ দ্যাখ্। গাড়ির চাকার দাগ বরাবর নিশ্চয়ই কোনো কাঠ-টাট পেতে নিজেদের গাড়ি পার করেছে। আমরা ঐ অবধি গেলেই গাড়ি গর্তে পড়ে যেত, আর আটকে যেতাম আমরা। মারাও যেতে পারতাম। গর্তটা কত গভীর, তা কে জানে?

কি করবে? আমি নার্ভাস গলায় বললাম।

ঋজুদা বলল, গাড়ি থেকে নেমে গর্তের বাঁদিকের জঙ্গলে ঢুকে জঙ্গলে জঙ্গলে তুই নাচঘরের দিকে এগিয়ে যেতে থাক্, যত তাড়াতাড়ি পারিস, ব্যাগ কাঁধে নিয়ে কক্-করা

পিস্তল হাতে নিয়ে। যত জোরে পারিস এগিয়ে যাবি—যতখানি পারিস ডিসট্যান্স কভার কর।

আর তুমি ?

আমিও আসছি। ওরা আমাদের এক্সপেক্ট করছে তৈরী হয়ে। আমরা যে এসেছি, তা ওদের জানান দিতে হবে না ?

বলেই, ঋজুদা ব্যাগ থেকে কতগুলো মোটা রাবার ব্যান্ড বের করল। আমাকে বলল, তাড়াতাড়ি একটা ফ্ল্যাট পাথর কুড়িয়ে দে ত' আমাকে, রুদ্র।

পথের পাশ থেকে একটা তিন-চার ইঞ্চি চওড়া-চ্যাপ্টা ভারী পাথর দিলাম ঋজুদাকে। ঋজুদা সেই পাথরটাকে গাড়ির এ্যাকসিলারেটরের উপর শুইয়ে রাবার ব্যান্ড দিয়ে বাঁধল—এঞ্জিন বন্ধ করে নিয়ে। তারপর গাড়িটাকে পাতা-চাপা-গর্তের একেবারে সামনে নিয়ে গেল—ঠেলে। নিজে ব্যাগ-ট্যাগ সমেত নেমে, দরজা খুলে রেখেই আবার সীটে বসে ফার্স্ট গীয়ারে দিল গাড়িটাকে। দিয়েই,—হেডলাইট জ্বেলে দিল—তারপর লাফিয়ে নেমে পড়ে, বাইরে থেকে হাত বাড়িয়ে এঞ্জিনের সুইচ টিপে দিল।

এ্যাকসিলারেটরে পাথরের ওজন ছিলই। এঞ্জিনটা গোঁ গোঁ করে প্রচণ্ড আওয়াজ করে উঠে একলাফে গিয়ে পাতার ঢাকনা ফুড়ে গর্তে পড়ল আর্তনাদ করে। হেডলাইটের একটা আলো সোজা সামনের রাস্তাটাকে আলোকিত করে রাখল। আর অন্য আলোটা আকাশের দিকে মুখ করে জ্বলতে লাগল।

ঋজুদা বলল, ফারস্ট ক্লাস। পুলিশ ফোর্সের আর খুঁজতে হবে না জায়গাটা। এঞ্জিনটা গোঁ-গোঁ করেই যেতে লাগল, গর্তে-পড়া জংলী শুয়োরের মত।

বাঁ দিকের অন্ধকারে খুব তাড়াতাড়ি আমি অনেকখানি এগিয়ে গেছিলাম। পথের সমান্তরালে। হঠাৎ দেখি, রাস্তা দিয়ে তিনজন লোক হাতে বন্দুক নিয়ে আলো-আঁধারীতে দৌড়ে যাচ্ছে গাড়ির দিকে। তাদের পোশাক ও মাথার ঝাঁকড়া চুল দেখে মনে হল যে, স্থানীয় লোক নয় এরা। কিন্তু তাদের পিছনে আরও একজন লোক দৌড়ে গেল। তাকে ভাল দেখা গেল না।

আমি দাঁড়িয়ে পড়ে পিছন ফিরে ওদের দেখছিলাম, এমন সময় রাস্তার ডানদিক থেকে একটা লক্ষ্মী-পেঁচা ডাকল। আবারও ডাকল।

বুঝলাম, ঋজুদা উল্টোদিকে পৌঁছে গেছে। ঋজুদা পেঁচার ডাক ডাকতে ডাকতে নাচঘরের দিকে যেতে লাগল জোরে দৌড়ে। আমিও দৌড়তে লাগলাম। নাচঘরের কাছে আসতেই দেখলাম মরচে-পড়া প্রকাণ্ড দুটো লোহার দরজা। বিরাট বিরাট কড়া-লাগানো। ভেজানো রয়েছে। ভিতর থেকে অল্প আলো আসছে বাইরে। ঋজুদা প্রথমে ঢুকল। পরে আমি।

রীতিমত বড় ঘরটা। এল্ শেপ্-এর ঘরে হ্যাজাক জ্বলছিল একটা। দেওয়ালের আয়নাগুলো খয়েরী, কালো দাগে ভরা। অনেকেই ভেঙে গেলেও সব তখনও ভাঙেনি। না-ভাঙা আয়নাগুলোতে আমাদেরই দুই মূর্তিমানের পিস্তল-হাতে ছায়া দেখে আমরা নিজেরাই চমকে উঠলাম। এক কোনায় একটা সাদা ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। সামনে ঘাস, বিচালী। তার মুখ আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি দিয়ে বাঁধা। যাতে ডাকতে না পারে। নানারকম পাঁচমিশেলী গন্ধ বেরোচ্ছে জায়গাটা থেকে।

হঠাৎ বোঁটকা গন্ধ পেলাম নাকে। এখানে আসার পরদিন ভানুপ্রতাপের গাড়ি থেকে যেমন গন্ধ পেয়েছিলাম। একটু এগিয়ে গিয়েই দেখি, প্রকাণ্ড লোহার খাঁচার মধ্যে, একটা

বিরাট হায়না দাঁত বের করে রাগে আমার দিকে দেখছে। তার গায়ের লোম অনেক জায়গায় ঝরে গেছে। ঘেয়ো কুকুরের মত।

উত্তেজিত হয়ে ডাকলাম, ঋজুদা। দ্যাখো, হায়না।

ঋজুদা অন্যমনস্ক গলায় বলল, জানি।

ঋজুদা আমার ঐ দারুণ আবিষ্কারে উত্তেজিত ত' হলোই না, মুখও ফেরালো না।

দুঃখিত হলাম খুব।

ঋজুদা এদিকে ওদিকে যেন কী খুঁজছিল। হঠাৎ একটা জায়গায় গিয়ে থেমে গেল। একটা সুড়ঙ্গ।

নাচঘরের অন্য দিক থেকে নানারকম হিস্‌হিস্ আওয়াজ আসছিল। ঐ দিকে গিয়ে টর্চ ফেলতেই দেখি, একটা গভীর গর্তের মধ্যে কম করে তিরিশ-চল্লিশটা নানা জাতের সাপ কিলবিল করছে। গর্তের পাশগুলো মসৃণ পিতলের। তাতে কোনো তেল ঢেলে আরও মসৃণ করা হয়েছে। তাই গর্তের গা বেয়ে উঠে আসা সাপেদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর তারই পাশে একটা লোহার-জাল-লাগানো খাঁচায় প্রকাণ্ড একটা সাপ হিস্‌স্ হিস্‌স্ করে এমনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে, মনে হচ্ছে খাঁচাটাকে শুদ্ধু নিয়ে সে আমাদের দিকে ছুটে আসবে। একটুখন দেখেই, সে-মক্কেলকে দেখে চিনতে একটুও দেরী হলো না আমার।

ঋজুদা বলল, চল্ রুদ্র। আর দেরী করার সময় নেই। বলেই, টর্চের বোতাম টিপে সুড়ঙ্গের মধ্যে নেমে পড়ল। আমরা যখন সুড়ঙ্গে নামছি তখন অনেক দূর থেকে বন্দুক ও রাইফেলের আওয়াজ ভেসে এল গুম্ গুম্ করে।

সুড়ঙ্গটা প্রথমে তিন-চার ধাপ নেমেছে। নেমে অনেকটানি সোজা চলে গেছে। খুবই লম্বা ও বড় সুড়ঙ্গ। ঋজুদার মত লম্বা লোকেরও মাথা নোয়াতে হচ্ছে না। এবং আমরা পাশাপাশিই যেতে পারছি দুজনে। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর দেখলাম, সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। ভিজে, ভিজে, স্যাঁতসেঁতে, ক্ষয়ে-যাওয়া সিঁড়ি।

যত তাড়াতাড়ি পারি আমরা উঠে গিয়েই সুড়ঙ্গের মুখে একটা লোহার ভারী দরজার সামনে পৌঁছলাম। তা অন্য দিক থেকে বন্ধ।

ফিস্‌ফিস্ করে আমি বললাম, কি হবে, ঋজুদা ? যদি ওরা সাপ আর হায়নাটাকে ছেড়ে দেয় সুড়ঙ্গের মধ্যে ? যদি আগুন লাগিয়ে দেয় ? যদি ঐ সাপটাকে.....

কথা বলিস না। ঋজুদা ফিস্ ফিস্ করে বলল।

তারপর বলল, তুই পেছন দিকটা দ্যাখ্। পিস্তল হাতে রাখ্। একেবারে রেডী। ভগবান এলেও মেরে দিবি ; দুবার না ভেবে।

ঋজুদা ব্যাগ থেকে কি একটা গোল কিন্তু লম্বাটে লোহার জিনিস তাড়াতাড়ি বের করল। করেই পাইপের লাইটার জ্বেলে তাতে আগুন জ্বালল। ছোট্ট একধরনের গ্যাস-সীলিন্ডার। আমাকেই কিনে আনতে বলেছিল কলকাতা থেকে। কিন্তু অত ছোট সীলিন্ডার দিয়ে কি হবে কিছুই বুঝতে পারিনি তখন আমি। বরং ভেবেছিলাম, কারো অসুখ হলে অক্সিজেন দেবে বুঝি।

ঋজুদা ফিস্ ফিস্ করে বলল, এদিক থেকে অনেক চেষ্টা করা হয়েছে দরজা ভাঙবার। এই বুদ্ধিটা যে কেন মাথায় ঢোকেনি ওদের !

লোহা কাটতে লাগল ঋজুদা নিঃশব্দে। নিঃশব্দে ঠিক নয়, ফিস্ ফিস্ শব্দ হতে লাগল, অতি সামান্য। লোহা গলে পড়তে লাগল।

মিনিট দু-তিনের মধ্যেই উল্টোদিকের তালার কড়া গলে গেল।

দরজাটাতে ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই, আমরা বিষেণদেওবাবুর, প্রায় ময়দানের মত বড় শোবার ঘরে ঢুকে পড়লাম, কাপড়-চোপড়ের একটা আলনা উল্টে ফেলে। সেটা দিয়েই সুড়ঙ্গের দরজাটা আড়াল করা ছিল।

হায় বজরঙ্গবলী!

বলেই, ইজীচেয়ারে শুয়ে, গড়গড়ার নলে টান দিতে-থাকা বিষেণদেওবাবু এক লাফে তা থেকে উঠতে গিয়েই গড়গড়ার নলে পা জড়িয়ে গড়গড়া-টড়গড়া নিয়ে উল্টে পড়ে গেলেন।

প্রকাণ্ড ঘরটার অন্য কোণে উনি ট্রানজিস্টর শুনছিলেন, সেটাকে প্রায় কানের কাছে রেখে। তাই, আমাদের কোনো আওয়াজই শুনতে পাননি।

আমাদের দুজনের হাতেই খোলা পিস্তল দেখে বিষেণদেওবাবু কাঁদো-কাঁদো হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে বললেন, ঋজুবাবু! এই কি মেহমানের কাজ? ছিঃ ছিঃ। হায় বজরঙ্গবলী! আমার যা আছে সব নিয়ে যান, আলমারীর চাবি দিচ্ছি, সোনা জহরৎ, টাকা-পয়সা সব কিছু—আমাকে শুধু জানে মারবেন না। আমি চলে গেলে ছেলেটা একেবারে ভেসে যাবে ঋজুবাবু। আমাকে দয়া করুন। ভানুর, আমি ছাড়া কেউই নেই।

ঋজুদা সুড়ঙ্গের দরজাটা বন্ধ করে তার সামনে একটা টেবল দিয়ে ঠেকা দিল।

তারপর তাড়াতাড়ি বিষেণদেওবাবুকে বলল, সময় নেই, সময় নষ্ট করবার। কোনো বাজে কথা শোনারই সময় নেই এখন আমাদের। আপনি শীগগির সামনের এই ওয়াড্রোবটার মধ্যে ঢুকে পড়ুন। দরজাটা নিজেই ধরে রাখবেন ভিতর থেকে, একটু ফাঁক করে। ফাঁক দিয়ে নিঃশ্বাস নেবেন।

হায় বজরঙ্গবলী। হায় বজরঙ্গবলী। কী বিপদ! কী বিপদ! ভানু কোথায়? ভানু?

ঋজুদা বিষেণদেওবাবুর উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে বলল, রুদ্র, তুই সুড়ঙ্গের দরজার বাঁ পাশে গিয়ে ঐ টেবল্টার উপরে উঠে দাঁড়া। পিস্তল রেডী রাখিস। দেখিস, ঐ ওয়াড্রোবের দিকেই আবার যেন গুলি চালাস না। খু-উ-ব সাবধান।

বলেই, এই পায়ে লাথি দিয়ে টেবল্টাকে সরিয়ে দিল সুড়ঙ্গের মুখ থেকে। সুড়ঙ্গের দরজাটা হাঁ করে খুলে রইল।

মিনিট তিনেক চুপচাপ। মৃত্যুর মত নিস্তব্ধ। শুধু এ বিপদের মধ্যেই গড়গড়ার নলটা নিজের দিকে টেনে নিয়ে ঋজুদা ভুড়ুক্ ভুড়ুক্ করে টানছিল। পাইপটা গাড়িতেই রেখে এসেছিল, গাড়ি ছেড়ে আসবার সময়। পাছে, পাইপের তামাকের গন্ধ বিট্রে করে আমাদের।

ঐ সাংঘাতিক সিচুয়েশানেও ফিস্ফিস্ করে ঋজুদা আমাকে বলল, গয়ার অম্বুরী তামাক—ফারস্ট ক্লাস। বুঝলি রুদ্র!

বিষেণদেওবাবু সেই কথা শুনে অবাক হয়ে ওয়াড্রোবের দরজা খুলে ধরে বললেন, অজীব আদ্‌মী হ্যায় আপ্।

ঋজুদা প্রায় ধমকে বলল, দরজা বন্ধ করে মুখ ভিতরে করুন শিগগিরি।

ঠিক সেই সময়ই সুড়ঙ্গের নীচ থেকে কী একটা নরম কিন্তু দ্রুতগামী আওয়াজ ভেসে এল।

তারপরই মনে হল, একটা ঝড় আসছে। পাতাল ফুঁড়ে।

গড়গড়ার নল আর পিস্তলটা সাইড-টেবলের উপর রেখে, বিষেণদেওবাবুর দরজার পেতলের ভারী খিল্টা হাতে তুলে নিল ঋজুদা। তুলে নিয়েই দু' হাতে ধরে মাথার উপরে

তুলল।

বিষেণদেওবাবুর ওয়াড্রোবের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার আরও এক মেহমান আসছে।

আমার খুব ভয় করতে লাগল। ঋজুদা ভুল করছে। এ সাপ, সাপ নয়; অভিশাপ।

মুহূর্তের মধ্যে সাপটা এসে গেল। সে যেই সুড়ঙ্গের দরজা দিয়ে মুখ বের করে সিঁড়ি থেকে মাথা তুলে মেঝেতে মাথা রাখল—অমনি ঝন্‌ঝন্ করে পিতলের খিলটা পড়ল তার মাথায়।

কিন্তু অত বড় সাপের মাথায় মাল্টিস্টোরিড বাড়ির পাইলিং করার লোহার চৌকো হাতুড়ী পড়লেও বোধহয় কিছুই হতো না। আঘাত পেল ঠিকই—কিন্তু খিল্টাই লাফিয়ে উঠলো; যেন রাবারের উপর পড়েছে গিয়ে। খিল্টা লাফিয়ে উঠেই ঋজুদার হাত থেকে ছিটকে গিয়ে মেঝের একেবারে মাঝখানে চলে গেল ঝন্‌ঝন্ করে। সাপটা এবার ফণা তুললো। কী ফণা!—ফণা তুলে, একবার ডানদিকে আর একবার বাঁদিকে দেখলো। ঋজুদাকে দেখামাত্রই সে প্রায় ছ' ফিট লম্বা হয়ে দাঁড়ালো পুরো ফণা ছড়িয়ে, জলপাই-সবুজ রঙ তার পিঠের, পেটের দিকে কালো-সাদা ডোরা, প্রকাণ্ড বড় হাঁ, একজোড়া বীভৎস দাঁত ও একটা এক হাত লম্বা চেরা-জিভ দিয়ে সে যেন পৃথিবী ধ্বংস করবে বলেই মনে হল।

আমি আমার অজান্তেই টেবলের উপর দাঁড়িয়ে ফণাটার গোড়াতেই লক্ষ করে মনে মনে জয় বজরঙ্গবলী বলে পিস্তলের ট্রিগার টানলাম। ঘরের মধ্যে শর্ট ব্যারেলের পিস্তলের আওয়াজ গমগম্ করে উঠল। গুলিটা সাপটার মাথা এ ফোঁড় ওফোঁড় করে বিষেণদেওবাবুর রাইটিং টেবলের উপরে রাখা একটা সুন্দর ঝাড়বাতিকে ঝন্‌ঝন্ করে ভেঙে দিল। গুলি খেয়েই সাপটা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করার মত মাটিতে লুটিয়ে পড়ল একবার। কিন্তু মুহূর্তের জন্যে লুটিয়ে পড়েই যেই আবার উঠতে যাবে, ভারী মেহগনী কাঠের গোল টেবল্টাকে মুহূর্তের মধ্যে দু' হাতে তুলে নিয়ে ঋজুদা তার গায়ের উপরে দড়াম্ করে ফেলে দিল। এজ্জ, লাক্ উড হ্যাভ ইট্; পড়ল ত' পড়, একেবারে কোমরেরই উপর। মাথায় গুলি খেয়ে কোমরটাতেও চোট খাওয়াতে এত বড় কালনাগ ঘরের মধ্যে যে কী তাণ্ডব শুরু করল সে কী বলব! তার চোখের আগুন, দাঁতের বাহার, জিভের লক্‌লক্—ও বাবা গোঃ।

বিষেণদেওবাবু ওয়াড্রোবের দরজা একটু ফাঁক করে, হায়! হায়! করেই আবার দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

ওয়াড্রোবের ফাঁক থেকে মাঝে মাঝেই শুধু বিষেণদেওবাবুর হায় বজরঙ্গবলী, জায় বজরঙ্গবলী, হায় বজরঙ্গবলী শোনা যাচ্ছিল কান্না-মেশানো দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে।

ঋজুদা বলল, তুই এবার আমার জায়গায় এসে দাঁড়া রুদ্র। আমি এ ব্যাটাকে ঠাণ্ডা করি।

আমি ঋজুদার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতেই ঋজুদা পেতলের খিলটাকে আবার তুলে নিয়ে পর পর সাপটার মাথায় গোটা দশ-বারো মোক্ষম বাড়ি মারাতে সাপটা অবশেষে ফণাটা নামিয়ে মেঝেতে শুলো। ওর দীর্ঘ, তীব্র ঝাঁঝালো পথ এবারে শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু কয়েক ঘন্টার মধ্যেও যে সে মরবে এমন কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। কেবলই উল্টে-পাল্টে হিস্‌হাস্ করতে লাগল। আমি যে টেবল্টাতে এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম,

সেটাকেও উল্টে দিলাম সাপটার উপরে।

এমন সময় আমার নাকে একটা বোঁটকা গন্ধ এবং ঋজুদা, আফ্রিকাতে ভুযুওয়ার গুলি খাওয়ার পর ঋজুদাকে খুঁজতে গিয়ে পাথরের উপর যেমন নূপুরের শব্দের মত শব্দ এসেছিলো কানে, ঠিক তেমনই শব্দ পেলাম।

রেডি হয়েই রইলাম। গন্ধটা জোর হতে লাগল, পায়ের নখের শব্দটাও ; হঠাৎ একেবারে কাছে এসে গেল।

যেই লোম-ওঠা হতকুচ্ছিৎ হায়নাটা মাথা বের করবে ঘরের ভিতরে, আমি তার ঠিক বাঁ কানের ফুটোর মধ্যে দিয়ে একটা গুলি চালান করে দিয়ে অন্য কান দিয়ে বের করে দেব মনস্থ করে পিস্তল তুলেই রেখেছিলাম। কিন্তু সে মাথাটা ঘরে ঢোকাবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্লপ্ করে একটি চাপা নরম আওয়াজ হল। কি হল, বোঝবার আগেই, লোম-ওঠা, ঘেয়ো হায়নাটা জিভ বের করে মেঝেতে চার-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। যেন ঘুমোবে। যেন অনেকদিন থেকে অনেক ঘুম জমা হয়েছিল ওর মধ্যে।

এর পর আর কিছুই ঘটলো না। আমি ভেবেছিলাম, সেই ঝাঁকড়া-চুলের জংলী লোকগুলোও বুঝি আসবে। তারা কারা কে জানে ? আর তাদের পিছনের লোকটি ? সে কে ?

যেন, আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই ঋজুদা বলল, পুলিশ আসবে এখুনি।

বিষেণদেওবাবু খুব ভয় পেয়ে মুখ কালো করে বললেন, পুলিশ ? পুলিশ কেন ? আমি ত' কিছুই বুঝতে পারছি না। কোনও মানুষ ভি খুন হলো না কি ? আমি ত' নির্দোষ। আর আমার ভানু ত' ফুলের মত ; শিশু।

ঋজুদা বলল, মামা-ভাগ্নের ব্যাপার। সেসব আপনারাই জানেন।

বিষেণদেওবাবু আবার বললেন, ভানু ? ভানু কোথায় ? সত্যি কথা বলুন ঋজুবাবু, আমার ভানুর কোনো বিপদ ঘটেনি ত' ?

ঋজুদা কি বলতে যাবে বিষেণদেওবাবুকে, ঠিক এমনি সময়ে সুড়ঙ্গ দিয়ে পুলিশের একজন বড় অফিসার আর তাঁর সঙ্গে দু'জন দারোগা ও চারজন কনস্টেবল খোলা রিভলবার, রাইফেল আর টর্চ হাতে বিষেণদেওবাবুর ঘরে ঢুকেই ঐ বিরাট নড়াচড়া করা সাপ আর মরা হায়নাটা দেখে চমকে উঠলেন। তারপরই আমাদের দু'জনের দিকে রাইফেল, রিভলবার তুললেন।

ঋজুদা বলল, গুল্‌লি-অলি। সঙ্গে সঙ্গে আমিও বললাম, গুল্‌লি-অলি।

বিষেণদেওবাবু ওয়াড্রোব থেকে বাইরে বেরোতেই পুলিশ সাহেব দ্বিতীয়বার চমকালেন।

ঋজুদা বলল, পুলিশ সাহেবকে—আপনি ত' চেনেনই রাজা বিষেণদেও সিংকে। আর আমিই হচ্ছি ঋজু বোস। আর এই আমার এ্যাসিস্ট্যান্ট, রুদ্র।

॥ ১০ ॥

ডি-এস-পি রহমান সাহেব এবং অন্যান্যদের নিয়ে বিষেণদেওবাবু বসার ঘরে বসেছিলেন মুখ নীচু করে। সঙ্গে ঋজুদাও ছিল। সকলকে নাস্তাপানি দিচ্ছিল খিদমদ্গার ও বেয়ারারা।

ঘর থেকে অন্য একটা পাইপ এনে ঋজুদা চুপচাপ পাইপ খাচ্ছিল। আর কি যেন ভাবছিল। রহমান সাহেবের ফোর্স তিনজন লোককে এ্যারেস্ট করেছেন। একজন

উন্ডেড। ওঁদের একজন কনস্টেবলও উন্ডেড হয়েছে। পায়ে এল-জি লেগেছে। উন্ডেডদের নিয়ে একটি পুলিশ ভ্যান চলে গেছে সদরের পুলিশ হসপিটালে। তবে ভানুপ্রতাপকে পাওয়া যায়নি। ব্রিজনন্দনকেও নয়।

একটু আগেও রহমান সাহেব ঋজুদাকে বলেছেন—মিস্টার বোস মাই আই-জি হ্যাজ স্পোকেন ভেরী হাইলী অফ উ্য টু আমরা সবই ত' বুঝতে পাচ্ছি—কিন্তু এভিডেন্স্ ত' একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। আজকে উজ্জানপুরের জমিদার সুরিন্দারবাবু আর তাঁর স্ত্রী শুভাবাঈ-এর মৃত্যু যে মার্ডার, তা প্রমাণ করবেন আপনি কি করে ? সাক্ষীও পাবেন না। এভিডেন্সও নেই কোনো। যদি কোনো ফ্রেশ-মার্ডার হত, তবে না-হয়......

ঋজুদা পাইপের ধুঁয়ো ছেড়ে বলল, তাহলে বলছেন, আপনাদের সুবিধে হত যদি বিষেণদেওবাবুও মার্ডার হওয়া অবধিই অপেক্ষা করতাম আমরা ?

তারপর বলল, ওঁকে বাঁচিয়ে তাহলে আমরা সকলে খুবই অন্যায় করে ফেলেছি বলুন ?

রহমান সাহেব একটু বিরক্ত হলেন। এ-দেশের পুলিশ, তাঁদের মুখের ওপর কেউ কোনো কথা বললে তা বরদাস্ত করতে পারেন না।

রহমান সাহেব বললেন, স্যার। আপনি একটু আনরীজ্‌নেব্‌ল হচ্ছেন।

—মোটেই নয়।

ঋজুদা বলল। আমি এতেই খুশী। বিষেণদেওবাবুকে বাঁচাতে পেরেছি, এটাই আমার মস্ত লাভ। ভানুপ্রতাপ ধরা পড়ুক আর নাই-ই পড়ুক। এত কিছুর পরও যদি আপনারা বলেন যে, প্রমাণ-সাবুদের অভাব আছে ; তাহলে নাই-ই বা ধরলেন তাকে। তবে, না-ধরলে বিষেণদেওবাবুর বাকি জীবনের নিরাপত্তার দায়িত্ব আপনাদেরই নিতে হবে। তাতে কি আপনারা রাজী আছেন ?

এ ত' আন্‌প্র্যাকটিকেবল্ কথা হল।

রহমান সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন।

এমন সময় ঋজুদা বলল, রুদ্র। তুই এঁদের জীপেই চলে গিয়ে আমার ট্রান্সমিটারটা আর নদীর বেড থেকে টেপ-রেকর্ডারটা তুলে নিয়ে আসবি। যা ! চলে যা !

তারপর রহমান সাহেবকে একটা জীপ দিতে অনুরোধ করলো ঋজুদা।

রহমান সাহেব আমার সঙ্গে একজন দারোগাকেও যেতে বললেন।

আমরা মালোঁয়া-মহল থেকে পাঁচশ গজও যাইনি, দেখি, যেখানে নাচঘরের দিকের পায়ে-হাঁটা পথটা এসে মিশেছে বড় রাস্তায় ঠিক সেই মোড়েই ব্রিজনন্দন পড়ে আছে মুখ থুবড়ে। পথের ধুলোর উপর। দুদিকে দু' হাত ছড়িয়ে।

দারোগা সাহেব লাফিয়ে নামলেন। বললেন, মার্ডার।

সাপে কামড়েছিল ব্রিজনন্দনকে। ডান হাতের বাহুতে গোলাপী টেরিলীনের পাঞ্জাবীর উপরে দু'দিকে দুটি গভীর ক্ষত। মুখে গ্যাঁজ্‌লা। মরতে বোধহয় সময় লাগেনি বেশী।

জীপ ঘুরিয়ে মালোয়াঁ-মহলে এলাম আমরা লাশ নিয়ে।

ঋজুদা বলল, রহমান সাহেব আপনি যা চাইছিলেন, তাই-ই হল। ফ্রেশ মার্ডারই হল শেষ পর্যন্ত। এখন ইমিডিয়েট্‌লী ঐ সাপটাকে আর ব্রিজনন্দনকে হাজারীবাগ সদরে নিয়ে যান। ফরেনসিক ও মেডিক্যাল এক্সপার্টরা পরীক্ষা করে দেখুন, ব্রিজনন্দন এই সাপের কামড়েই মারা গেছে কী না। তাহলেই......

রহমান সাহেব বললেন, এটা ভাল বলেছেন। এ ত' করতেই হবে। তারপর ঋজুদাকে খুশী করার জন্যে বললেন, এই কেস ঠিকমত ইনভেস্টিগেট না করলে আমার

নোকরী যাবে। ওয়েস্ট বেঙ্গলের আই-জি সাহাব আমাদের আই-পি-জি সাহাবকে যখন বলেছেন।

ঋজুদা আবারও বলল, তুই আবার যা অন্য জীপে করে রুদ্র, কাউকে নিয়ে—ঐগুলো নিয়ে আয়।

আমি আবারও উঠলাম। আজই সেই ভোরে কোলকাতা থেকে ট্রেনে চড়ে ধানবাদ এসে এতখানি গাড়ি চালিয়ে পৌঁছেছি। তারপর ত' কাণ্ডর পর কাণ্ড। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাণ্ড। এখন রাত প্রায় এগারোটা বাজে। ঘুম পেয়ে গেছে আমার।

আবারও বেরিয়ে যাওয়ার আগে আমার হঠাৎ মনে হল ব্রিজনন্দনের কোমরে ত' সব সময় একটা রিভলবার থাকত ; সেটা আছে ত' ?

পুলিশদের বলতেই সঙ্গে সঙ্গে ওঁরা খুঁজলেন।

না। নেই। হোলস্টার আছে, কিন্তু রিভলবারটি নেই। কেউ নিয়ে গেছে।

ঋজুদাকে বললাম কথাটা। ঋজুদা পাইপের একগাল ধুঁয়ো ছাড়ল শুধু আমার দিকে তাকিয়ে।

ঋজুদা বলল, চলুন রহমান সাহেব। আমরাও দুজনে জায়গাটা একবার দেখে আসি।

দুটি জীপে করে ঐখানে পৌঁছেই ঋজুদা ভালো করে টর্চের আলো ফেলে ব্রিজনন্দন যেখানে পড়েছিল তার চারপাশ—নাচঘরে যাওয়ার পথ এবং গীমারিয়ার পথে ভালো করে কী যেন খুঁজতে লাগল।

তারপর রহমান সাহেবকে বলল, এ্যাই দেখুন।

রহমান সাহেবের সঙ্গে আমরাও দেখলাম যে একজনের জুতো-পরা পায়ের ছাপ—নাচঘর থেকে দৌড়তে দৌড়তে এসে গীমারিয়ার পথে চলে গেছে। আর পথের উপরে নাচঘর থেকে আসা ও ফিরে যাওয়া বিরাট সাপের দাগও স্পষ্ট।

ঋজুদা জুতোর দাগের দিকে চেয়ে বলল, ভানুপ্রতাপ ! রহমান সাহেব, আপনার ফোর্স নিয়ে পিসকি নদীতে গেলে এখনও ভানুপ্রতাপের সঙ্গে দেখা হতে পারে। চলুন, আমরাও আপনাদের সঙ্গে গীমারীয়ার রাস্তার মোড় অবধি যাই—ওখান থেকে ট্রান্সমিটারটা তুলে নিয়ে আসব।

তারপর নিজের মনেই বলল, টেপ রেকর্ডারটা আর পাবি না রুদ্র। যাই-ই হোক। ক্যাসেটটা ত' আছেই। তাতেই আমার কাজ হবে। এতক্ষণে ভানুপ্রতাপ টেপ রেকর্ডারটা খুঁজে বের করে জঙ্গলের গভীরে গা-ঢাকা দিয়েছে। ও ত' আর জানে না যে, তুই ক্যাসেট খুলে নিয়েছিস !

—কোথায় যেতে পারেন ভানুপ্রতাপ এখান থেকে জঙ্গলে ?

আমি বললাম।

যেখানে খুশী। জঙ্গলে জঙ্গলে পালামৌ, গয়া, চাতরা ; হান্টারগঞ্জ জৌরী, কত জায়গায় যেতে পারে। যেদিকে ইচ্ছে। চারদিকেই ত' জঙ্গল।

ঋজুদাকে বললাম, ঋজুদা ! আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।

কি ?

সাধের লাউ।

কি ? ব্যাপারটা কি ? ঋজুদা অধৈর্য গলায় বলল।

আরে, যে-ক্যাসেটটা রেকর্ডারে চেঞ্জ করে দিয়েছিলাম, তার মধ্যে "সাধের লাউ বানাইলো মোরে ডুগডুগি" গানটা ছিল।

উঃ রুদ্র। তুই ইনকরিজিবল্। তোকে অনেক বড় বড় লাউ কিনে দেব। এখন ফর গডস সেক, চুপ কর।

কি বলব ? ঋজুদা আমার কথার ফাইন পয়েন্টটাই বুঝলো না। গানটা কখনও শুনলে, ত' বুঝবে। লাউ কিনে আমি কি তরকারী খাবো ? যত্ত.....

ট্রান্সমিটারটা তুলে নেবার পর একটি জীপ আমাদের মালোয়াঁ-মহল-এ পৌঁছে দিল। রহমান সাহেব পুলিশ ভ্যান ভর্তি আর্মড কনস্টেবল এবং জীপে দারোগাদের নিয়ে চলে গেলেন পিসকি নদীর দিকে। হেডলাইট ও স্পটলাইট জ্বেলে।

মালোয়াঁ-মহলের বসবার ঘরের প্রকাণ্ড সোফাতে বিধ্বস্ত বিষেণদেও সিং বসেছিলেন। চোখ দুটি জবাফুলের মত লাল। মনে হচ্ছিল, গত একঘণ্টাতে ওঁর বয়স দশ বছর বেড়ে গেছে।

পুলিশের একটা ব্রেক-ডাউন ভ্যান ঋজুদার ফিয়াট গাড়িটাকে টেনে নিয়ে এল ফটকের মধ্যে দিয়ে। এঞ্জিন বা রেডিয়েটরের কিছুই হয়নি। ডানদিকের কিছুই হয়নি। ডানদিকের মাডগার্ড এবং বাম্পার একদম তুবড়ে গেছে, যদিও চাকাতে আটকাচ্ছে না। অনেক স্ক্র্যাচ পড়েছে দুদিকেই। ডানদিকের জানালার কাঁচটাও ভেঙে গেছে।

ঋজুদা বিষেনদেওবাবুর দুটি হাত ধরে নরম গলায় বলল, আমরা এখনই বেরিয়ে পড়তে চাই বিষেণদেও বাবু। সারারাত চালিয়ে ভোরে আসানসোল কি ধানবাদ পৌঁছে যাব। তারপর কিছুটা রেস্ট করে, কোলকাতা।

তারপর একটু থেমে বলল, আমি খুব দুঃখিত। আপনার জন্যেই দুঃখটা সবচেয়ে বেশী।

বিষেণদেওবাবু দাঁড়িয়ে উঠে ঋজুদার দু' হাত ধরে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললেন, বাচ্চা ছেলের মত।

বললেন, ঋজুবাবু, যে মালিক, সে কখনও নিজেরটাই চুরি করে ? যে, বংশের একমাত্র বাতি—যে আমার আঁখোকা রোওশ্নী—সে কিসের জন্যে এমন হয়ে গেল ? ভানু আমাকেও কেন শেষ করে দিলো না। আমাকে আপনি বাঁচিয়ে দিয়ে মরারও অধম করে রেখে গেলেন ঋজুবাবু ! এখন কি করে আমি বাঁচব বাকি জীবন ? এ বাঁচা কি বাঁচা ?

ঋজুদা মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর বলল, ঐ ড্রাগ-এডিকশানই ওর সর্বনাশের মূল। ও একটা ইভিল-জিনিয়াস্ হয়ে উঠেছিল।

হ্যাঁ। প্রথম দিকে, লানডানে, পড়াশুনায় ও খুবই ভাল ছিল। বলুন ত' ! এ কী বরবাদীর রাস্তা বেছে নিল এত বড়া খানদানের ছেলে ? নিজের বাবাকে মারল, মাকে মারল ? আমি না-হয় বাইরের লোকই হলাম।

বাইরের লোকই হলাম ! বলে, আবারও জোরে কেঁদে উঠলেন বিষেণদেওবাবু।

আমার চোখে জল এসে গেল।

গাড়িতে আমি মালপত্র উঠিয়ে, গুছিয়ে নিচ্ছি। ঋজুদা বিষেণদেওবাবুকে কোলকাতায় ঋজুদার বাড়িতে কিছুদিন এসে থাকবার জন্যে অনুরোধ জানাল। এবার ঋজুদাও গাড়িতে উঠবে।

বিষেণদেওবাবু বাইরে অবধি এলেন। গাড়ির দরজায় হাত রেখে দাঁড়ালেন।

বললেন, ঈসস্ গাড়িটার কি হাল।

তারপর বললেন, আমাদের ঐ মার্সিডিস গাড়িটা আপনি নিয়ে যান ঋজুবাবু।

কে চড়বে ? এ ত' ইম্পোর্টেড গাড়ি। আমি ত' ডিজেল-এঞ্জিন বসানো জীপে চড়ে—ভাগ্যের জন্যে পয়সা জমাচ্ছিলাম। এজ আ ট্রাস্টী !

ঋজুদা বলল, আমি সাধারণ লোক বিষেণদেওবাবু, আমার এই সাধারণ গাড়িই ভাল সেই সময় হঠাৎ আমার মনে পড়ল বাথরুমের মধ্যে বন্ধ লোকগুলোর কথা।

তাড়াতাড়ি একটা পুলিশকে ডেকে বললাম সেকথা।

ঋজুদা যে তালা দিয়ে বাথরুম বন্ধ করা হয়েছে তার চাবিটা বের করে দিল। পুলিশরা দল পাকিয়ে উপরে চলল রাইফেল ও হাতকড়া নিয়ে।

বিষেণদেওবাবু আবার একটা ধাক্কা খেলেন।

বললেন, আপনাদের ঘরে ? বাথরুমে ? তিনজন ?

আমি বললাম, হ্যাঁ। আমাদের ছোরা নিয়ে খুন করতে গেছিল।

হায় বজরঙ্গবালী, হায় বজরঙ্গবালী—মেহেমানোকোভি এহি.....

ঋজুদা একটা কার্ড দিয়ে ওঁকে বলল, রহমান সাহেবকে দেবেন। সবরকম সহযোগিতা আমি করব। ওঁর দরকার হলে, ফোনও করতে বলবেন আমাকে। আর আপনি এসে থাকুন কদিন আমার কাছে।

॥ ১১ ॥

গাড়িটা ত' বাঘের বাচ্চার মত চলছে রে রুদ্র ? কে বলবে, অত বড় গাড্ডায় পড়েছিল। তবে, মনে হচ্ছে, সাস্‌পেনসানটা গেছে।

তা যাক্। আমি বললাম। আমরাই যে যাইনি এই ঢের ! এখানে আসা অবধি থেকে এই আজ চলে যাওয়া পর্যন্ত একটার পর একটা ব্যাপার যা সব ঘটল সবই যেন হেঁয়ালী। তুমিও সেরকম। কে যে কে ! আর কে যে কেন কি করছে তার কিছুই যদি বললে এখনও অবধি। মধ্যে দিয়ে প্রাণই যেতে বসেছিল। তার উপর এন্টারোস্ট্রেপ্।

বলেই, বললাম, মার কাঁচিটা ? এনেছো ত' ঋজুদা ?

ঋজুদা গাড়িটা থামিয়ে, পাইপটা ধরালো। তারপর বলল, তুই-ই চালা রুদ্র। আমি তোর পাশে বসে তোর ধাঁধার উত্তর দিতে দিতে যাই। ক্ষিদেও পেয়েছে খুব। বাজে কটা ?

—রাত একটা।

চল্ তোকে গরম জিলিপী, শিঙাড়া খাওয়াব কোথাও, ভোরবেলা।

আমি বললাম, জানো,—প্রথম থেকেই আমি ভাবছি, বিষেণদেওবাবু-ই যত গোলমালের গোড়া। আর শেষে কী না ভানুপ্রতাপ।

—তোর দোষ কি ? প্রথমে আমিও তাই-ই ভেবেছিলাম। এবার তুই জিজ্ঞেস কর, তোর যা যা প্রশ্ন আছে।

অ্যাল্‌বিনোটা কোথায় গেল ? রোজই ত' ডাকাডাকিও করত। এই সব ঝামেলাতে পড়ে মাঝখান দিয়ে আমার অ্যাল্‌বিনো বাঘটাই মারা হল না।

অ্যাল্‌বিনো কেন, এই জঙ্গলে কোনো বাঘই নেই এখন। একটা বুড়ো হায়না আছে শুধু।

নেই মানে ? এত পায়ের দাগ। ডেকে ডেকে মাথা গরম করে দিল রোজ সন্ধেবেলাতে।

না। বাঘ নেই। যে-বাঘের ডাক শুনেছিস তা চিড়িয়াখানার বাঘের ডাক।

টেপ্-করা।

ভানুপ্রতাপ কিংবা তার কোনো লোক টেপ-রেকর্ডারের বোতাম টিপে জঙ্গলে ওটা নিয়ে হাঁটত রোজ সন্ধেবেলাতে।

তারপর বলল, স্বাভাবিক অবস্থাতে বাঘ হাঁটতে হাঁটতে কখনও ডাকে না। হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়িয়ে পড়ে, মুখ ঘুরিয়ে ডাকে। প্রথমদিন ডাক শুনেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। ডাকটা অমনভাবে জায়গা বদলাচ্ছে শুনে। যাক্ বাঘের ডাকের টেপ সঙ্গে করেই ত' নিয়ে এসেছি। কোলকাতা গিয়ে তোকে শোনাব।

—আর পায়ের দাগ ?

—সেটা তোর বোঝা উচিত ছিল কাথবার্টসন হার্পারের হালদারবাবুর কাছে যখন পাঠিয়েছিলাম তোকে, তখনই। বেচারী বিষেণদেওবাবু ! ঘাড়ের দাদ চুলকোবার জন্যে যা বানিয়েছিলেন তাতে যে তাঁর নিজের ঘাড়টিই চলে যেতো তা উনি কি আর জানতেন ? রাজা-রাজড়ার ব্যাপার। কেউ কখনও শুনেছো, না শুনলেও বিশ্বাস করবে যে দাদ চুলকোবার জন্যে বাঘের থাবা স্টাফ্ করিয়ে, থাবার নীচে ভেলভেট্ দিয়ে, তাতে হ্যান্ডেল লাগিয়ে এমন জিনিস বানানো যায় ?

ভেল্‌ভেট দিয়ে মানে ?

নদীর বালিতে বাঘের থাবার দাগে ভেলভেটের দাগ পরিষ্কার ফুটে উঠেছিল—তাছাড়া পাতার মধ্যেটা অস্বাভাবিক উঁচু করে দিয়েছিলেন হালদারবাবুর লোকেরা স্টাফ করবার সময়। ওটা বানিয়েছিলেন বিষেণদেওবাবু। কিন্তু চুরি করেছিল ভানুপ্রতাপ অ্যাল্‌বিনোর গল্প বানাবার জন্যে।

আচ্ছা ঋজুদা, হালদারবাবুকে তুমি একটা বড় খামে করে কি পাঠিয়েছিলে ?

তোর মায়ের বড় কাঁচিটা দিয়ে দেওয়াল থেকে ঝোলানো বাঘের চামড়াটার অন্য থাবাটাও কেটে পাঠিয়েছিলাম ওঁর কাছে, যাতে উনি শুওর হন। অন্য থাবাটি ত' আগেই কেটে বিষেণদেওবাবু ওঁকে পাঠিয়েছিলেন। স্টাফ করার জন্যে।

আমি বললাম, এবার বুঝেছি। এই জন্যেই তুমি বাঘটাকে কাছ থেকে দেখতে যেতেই ওঁরা দুজনেই হাঁ হাঁ করে উঠেছিলেন।

তা বটে। তবে দুজনের 'না' করার পেছনে কারণ কিন্তু আলাদা আলাদা ছিল।

বললাম, হুঁ।

কিন্তু অ্যাল্‌বিনোর সঙ্গে বিষেণদেওবাবুর মৃত্যুভয়ের কি সম্পর্ক ছিল ? তাছাড়া বিষেণদেওবাবুকে মারতেই যদি চাইবে ভানুপ্রতাপ, তাহলে ও আমাদের এ্যাভয়েডও করতে পারত। আমাদের দিয়েই বাঘ মারবার আয়োজন করল কেন সে ?

স্যান্ডি, মানে সুরিন্দার আর শুভার অল্পদিনের ব্যবধানে অস্বাভাবিক মৃত্যুতে অনেকেরই সন্দেহ হচ্ছিল যে, ওদের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। অথচ দেখলি ত' ? টুটিলাওয়ার হাজীসাহেব থেকে শুরু করে অনেকেরই ধারণা হয়েছিল যে, বিষেণদেওই খুন করেছেন ওদের। খুনের ব্যাপারে মোটিভটাই আসল। ভানুপ্রতাপই ত' একমাত্র বংশধর—তার কি দরকার মা-বাবাকে খুন করবার। আমিও কনফিউজড্ হয়েছিলাম এ কারণেই প্রথম থেকে। কারণ, ভানুপ্রতাপকে মারতে বিষেণদেওর যে মোটিভ, বিষেণদেওকে মারতে ভানুপ্রতাপেরও সেইই মোটিভ। একজন মারা গেলেই অন্যজন সমস্ত সাম্রাজ্যের মালিক হত। এই জিনিসটারই পুরো সুযোগ নিয়েছিল ভানুপ্রতাপ। কিন্তু ভানুপ্রতাপ যে পরিমাণ ড্রাগ খাচ্ছিল এবং লান্ডানে যে সমস্ত বন্ধুবান্ধব জুটিয়েছিল তাতে সম্পত্তির জন্যে তার

আর একদিনও অপেক্ষা করবার তর সইছিলো না। অল্প সম্পত্তিতেও তার মন ভরছিল না, সবই চাইছিল সে।

তোদের জেনারেশানের এই-ই দোষ। যা তোরা চাস সব এক্ষুনিই চাস্। তর সয় না তোদের। যা তোদেরই, তা পেতেও একটুও দেরী সয় না। সম্পত্তি ওর হাতে এলেই ও বিদেশে পাড়ি দিত। ওদের এক্সপোর্টের ব্যবসা। আন্ডার-ইনভয়েসিং, জাল-জয়চুরি করে বিদেশে ফরেন-এক্সচেঞ্জ ওরা জমাতে পারত। যে টাকার জন্যে নিজের মা-বাবাকে দু' মাসের মধ্যে খুন করতে পারে; তার পক্ষে অসাধ্য কিছুই ছিলো না। লানডানের বেইজ-ওয়াটার স্ট্রীটে বেড-সীটার মহল্লাতে ছাত্র-ছাত্রীদেরই ভীড়। নানারকম কাণ্ডই হয় সেখানে। আমার নিজের চোখে দেখা। টাকা, অনেক টাকা, অনেক টাকার দরকার ছিলো ভানুপ্রতাপের। তুই তখন কোলকাতা গেছিলি, তখন ওর সঙ্গে কথা বলে জেনেছিলাম, ও লানডানের প্লে-বয় ক্লাবের মেম্বার হয়েছিল। ঐ ক্লাবে আবু-দাবী আর দুবাইয়ের শেখরা আর সারা পৃথিবীর প্লে-বয়রা এক রাতে লক্ষ লক্ষ টাকার জুয়া খেলে। সব গুণই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল ও ইংল্যান্ড থেকে আসার সময়। হয়ত অনেক ধারও হয়েছিল সেখানে। জুয়া যাকে একবার পেয়েছে, তাকে ছাড়ে না সহজে। আসলে কি যে হয়েছিল, তা পুলিশের জেরায় আর ইনভেস্টিগেশানেই বেরোবে। এমনি এমনি ও আসেনি। মা-বাবা-মামাকে মেরে সর্বেসর্বা হয়ে ফিরে যাবার জন্যেই এসেছিল। ওখানে ফিরে গিয়ে ও ফূর্তি করত—মাঝে মাঝে ফিরে আসত বন্ধু-বান্ধবী নিয়ে। কিছুদিন খনির কাজ দেখে, টাকার সংস্থান করে আবার ফিরে যেত। এই হয়ত ছিল ওর ধান্দা।

বললাম, ঋজুদা, ভানুপ্রতাপ কি ওষুধ খেতেন? ওগুলো কি ঘুমের ওষুধ?

ঠিক ঘুমের নয়। শুনেছি, নানারকম ট্যাবলেটস আছে, নেম্বুটালস্; এ্যাম্ফিটামাইনস বারবিচুরেট। তাছাড়া, আরও নানারকম নেশা করে, যেমন হেরোইন, মেসকালিন; মাড়িজুয়ালা। জানি না, ও হয়ত মারিজুয়ানাই খেত—আমাদের দেশের গাঁজার মত ব্যাপার। ওর মধ্যে ডেলটা-নাইন-টেট্রাহাইড্রোক্যানাবিনল বা সংক্ষেপে, টি-এইচ-সি বলে একরকমের রাসায়নিক উপাদান থাকে। এ সব বেশী খেলে, মানুষের মানসিক বিকৃতিও ঘটে। ভানুপ্রতাপ যে মানসিক বিকারগ্রস্ত নয়; এমন কথাও জোর করে বলতে পারি না আমি। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে দেখলে, জানতে পারবেন।

আমি বললাম,কিন্তু ঝ্যালবিনোর নাম করে ছুলোয়া শিকার করিয়ে ওঁর কি লাভ হত?

লাভ হত এই যে, বীটাররা যখন বীটিং করত, হৈ-হল্লা শোরগোল, তার মাঝে টেপ-রেকর্ডারে বাঘের ডাক ডাকিয়ে ও বিষেণদেওবাবুকে অন্যমনস্ক করে দিত—দিয়ে, নিজেই হেঁটে গিয়ে বিষেণদেওবাবুকে মাচা থেকে নামতে বলত, মাচাটাও ভেঙে পড়তে পারত যে-কোনো সময়ে অন্তত একটা মাচা যেভাবে বাঁধিয়েছিল ও, তাতে কেউ বসলে যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই তা ভেঙে পড়ত তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। তারপর হয়ত ওর বেহেড়ীয়া চর হায়নাটাকে লেলিয়ে দিত পিছন থেকে—হায়নাটা ঘাড় কামড়ে ওঁকে শেষ করত। হায়নাটা উনি মাটিতে নামলে আগেও ওঁকে কামড়াতে পারত। এবং যেখানে হায়না কামড়াত সেখানে ও গুলিও করতে পারত দূর থেকে। এমনিতেও গুলি করতে পারত। বাঘের ডাক, গুলির শব্দ ও জংলী জানোয়ারের কামড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখে কারোই সন্দেহ থাকত না যে বিষেণদেওবাবুকে বাঘেই মেরেছে। নদীতে এত পায়ের দাগ বাঘের।

একটু চুপ করে থেকে ঋজুদা বলল, আসলে ঠিক কি যে করত, তা ওইই কেবল

জানত, আর হয়ত জানত ব্রিজনন্দন। অ্যালবিনোর গল্পটা চালু করত না ভানুপ্রতাপ তার সঙ্গে বিষেণদেওবাবুকে মারার কোনো সম্পর্ক না থাকলে।

তাই যদি হবে, তা উনি আমাদের ডাকতে যাবেন কেন? আমাদের ডেকে কি লাভ হল?

—আমাকে অনেকেই চেনে-জানে। আসলে, আমাকেই সাক্ষী মানতে চেয়েছিল ও। বিষেণদেওবাবুর কাছে, আমি মুলিমালোয়াঁতে আসছি শুনেই অ্যালবিনোর গল্প চালু করেছিল। শিকারী আসোয়া আর তার ছেলে রক্কাকে অনেক টাকা ঘুষ দিয়ে মিথ্যে কথা বলিয়েছিল বিষেণদেওবাবুর কাছে, ওরা বাঘ দেখেছে বলে। তবে, আসোয়ারা হয়ত আসলে ভানুপ্রতাপ কোন্ উদ্দেশ্যে এই মিথ্যা বলাচ্ছে না জানতোই না। পুলিশ ওদের জেরা করলেই তখন সত্যি কথা বেরুবে। আমি আর তুইই যে ভানুর কাল হবো, তা বোকারা একটুও বুঝতে পারেনি। যে-মুহূর্তে ও তা বুঝতে পেরেছিল; সেই মুহূর্তে আমাদেরও শেষ করে দিতে একটুও পিছপা হয়নি। তবে ওর বোঝাবুঝির আগেই অ্যালবিনোর চালটা ও চেলে দিয়েছিল। ওর রক্তে জুয়া ঢুকে গেছিল। চাল দেবার পর পাকা জুয়াড়ির মতই ভেবেছিল খেলাটা ওইই জিতবে।

জানালা দিয়ে পাইপের ছাই ঝেড়ে ঋজুদা বলল, তোকে বলিনি, যখন তুই ছিলি না—মানে যেদিন তুই কোলকাতা চলে গেলি, সেদিনই খুব বৃষ্টি হয় বিকেলে। খুব ঠাণ্ডা পড়ে যায়, সোয়েটার গায়ে দেওয়ার মত। পাঙ্খাপুলারদের পাখা টানতে মানা করে দিই আমি। ঘুমিয়ে আছি, গায়ে চাদর দিয়ে, হঠাৎ কী রকম অস্বস্তি বোধ হল। চোখ মেলে দেখি, ঘরে চাঁদের আলো এসে পড়েছে আর ঠিক আমার মাথার উপরে—যে-ফুটো দিয়ে টানা-পাখার দড়ি ঘরে ঢুকেছে সেই ফুটো দিয়েই একটা সরু সাপ ঢুকে, পাখার দড়ি বেয়ে নেমে আসছে। একেবারে আমার বুকে লাফিয়ে পড়বে, ঠিক সেই সময়ই সেন্স কাজ করায় ঘুম ভেঙে গেছিল আমার। তড়াক করে বিছানা থেকে নেমেই দরজার খিল খুলে নিয়ে তাকে বিছানাতেই পিটিয়ে মারি। সবুজ, পরিধিতে এক-আঙুল মত একটা সাংঘাতিক সাপ। একবার কামড়ালে, আর দেখতে হত না। রাতে কি ঘটেছিল, তা পরদিন আমার মুখ দেখে কেউই বুঝতে পারেনি। কিন্তু সেখানেই আমার একটু ভুল হয়ে গেছিল চালে। ব্যাপারটা যে কি ঘটেছিল, তা সাপটা ফিরে না-যেতেই ভানুপ্রতাপ বুঝেছিল। কিন্তু আমি ওকথা প্রকাশ না করাতেই ওর সন্দেহ ঘনীভূত হয়। আমার মতলব অন্য কিছু না থাকলে, সেই রাতেই চেঁচামেচি করে আমি বাড়ি মাথায় তুলতাম—নয়ত পরদিন সকালেই বলতাম সাপের কথাটা অন্তত সকলকে। তাই-ই করা উচিত ছিল—তাহলে ফাইন্যাল-অপারেশনটা অনেক কম ডেঞ্জারাস হতে পারত।

আমি বললাম, ভানুপ্রতাপের বাবা কি করে মারা যান? মানে, তোমার ধারণা কি?

দ্যাখ্, স্যান্তিকে আমি চিনতাম। ওঁর মত ভালো পোলো প্লেয়ার দেশে বেশী ছিলো না।

ওর মত ওস্তাদ ঘোড়সওয়ার ঘোড়া থেকে পড়ে মারা যেতে পারে বলে আমার এখনও বিশ্বাস হয় না। স্যান্তির মাথায় ভারী কোনো জিনিস, হাতুড়ি-টাতুড়ি দিয়ে হয় ভানুপ্রতাপ নিজে, নয় ব্রিজনন্দন অথবা ওর কোনো শাগরেদ বাড়ি মেরেছিল। তারপর এমন করে শুইয়ে দিয়েছিল পাথরের উপর সেই পাথরে ওরই রক্ত লাগিয়ে যে, কারোই সন্দেহের কারণ ছিলো না।

আর শুভাবাঈ? আমি বললাম। নিজের মাকে? ইস্স্......

শুভাবাঈ-এর জ্বর হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু ঠিক সেদিনই তার এখানকার পুরনো আয়া ওর জ্বর হওয়া সত্ত্বেও বাড়ি ফিরে যায়। সে আর কখনও ফিরে আসেনি। এই ব্যাপারটাও রহস্যময়। শুনেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। সে ভানুপ্রতাপের কাছ থেকে অনেক টাকা পেয়ে পালিয়ে গেছিল, না ভানুপ্রতাপই তাকেও সরিয়ে দিয়েছিল পৃথিবী থেকেই, তাও বলতে পারব না—কিন্তু যেদিন শুভাবাঈ মারা যায় সেদিন সে একাই শুয়েছিল তার ঘরে। আমার ঘরেরই মত কোনো না কোনো সাংঘাতিক বিষধর সাপ টানা-পাখার দড়ি-ঢোকার ফুটো দিয়ে এসে তাকে কামড়ে চলে যায় বলেই আমার বিশ্বাস। এপ্রিলের প্রথমে মারা যায় শুভাবাঈ। তখনও এখানে খুব প্লেজেন্ট ওয়েদার। টানা-পাখা চলে না তখন।

আমি বললাম, অস্বাভাবিক মৃত্যু ; কোনো পোস্টমর্টেম হলো না ? আশ্চর্য ?

ঋজুদা একটু চুপ করে থেকে গম্ভীর গলায় বলল, সন্দেহের কোনো কারণ না থাকলে এখনও খুব বড়লোক, আর রাজা-রাজড়ার বাড়িতে সহজে পোস্টমর্টেম হয় না। যাঁদের পয়সা আছে, তাঁদের সকলেই খাতির করেন। আইন ত' তামাশা! আইনের প্যাঁচে পড়লেও একমাত্র বড়লোকরাই পয়সা খরচ করে সে তামাশা দেখতে পারে। গরীবরা সে তামাশার খরচ জোগাতে পারে না। দুটি মৃত্যুই স্বাভাবিক ভেবেছিল সকলেই প্রথমেই। কিন্তু গত ক'মাসে যে বেহেড়ীয়াদের এনে নাচঘরকে একেবারে স্নেক-হাউস করে তুলেছিল ভানুপ্রতাপ, সে আর কে জানত ?

একটু চুপ করে থেকে, ঋজুদা বলল, আমাদের মত রেস্‌পেক্‌টেব্‌ল সাক্ষীর উপস্থিতিতে যদি বাঘের বীটিং-এ বাঘের হাতেই বিষেণদেওবাবু মারা যেতেন—তাহলেও পোস্টমর্টেম ভানুপ্রতাপ করতে দিতো না এবং আমাদেরই সাক্ষী মানত। আর এইখানেই ভানুপ্রতাপ মারাত্মক ভুল করেছিল। আমাদের কাছে ওর এই অ্যালিবিনোর চালটা না চাললে, বিষেণদেওবাবুকে ও নির্বিঘ্নেই মারতে পারত অন্যভাবে, আমরা চলে যাবার পর।

আমি বললাম, তাহলে ভূত-পেত্নীর ব্যাপারটা ? নাচঘরের ?

সেটা ত' খুবই সোজা! এটা তুই জিজ্ঞেস করবি আমাকে তা ভাবিনি। যাতে কেউ নাচঘরের দিকে ভুলেও না যায় দিনের বেলাতেও, তাইই টেপ-রেকর্ডারে বাঈজীর গান বাজিয়ে আর নিজে ঐ সাদা ঘোড়াটাতে রাতে চেপে বেরিয়ে পুরো জায়গাটাকে একটা ভৌতিক আবরণে মুড়ে দিতে চেয়েছিল ভানুপ্রতাপ। নইলে, পেত্নী কখনও সারেঙ্গী তবল্‌চি নিয়ে গান গায় ? এবং শুধু গানই নয়, একেবারে আলাপ, বিস্তার তান দিয়ে ? এ এক অভাবনীয় ব্যাপার। তাছাড়া, তুই যাওয়ার রাতে এবং পরদিন রাতেও এ' গানই শুনেছিলাম। ঐখানেও একটা নীরেট বোকামি করেছিল ভানুপ্রতাপ। কোনো নামকরা গাইয়ের একটিমাত্র গানই টেপ করেছিল। ভানুপ্রতাপ নিজে নিশ্চয়ই গানবাজনা ভালবাসে না—বাসলে, অমন করতো না, অন্তত কিছু ভাল গান শোনাতে পারত আমাদের। আর গান ভালোবাসত না বলেই ত' ও খুনী।

একটু চুপ করে থেকে আবার ঋজুদা বলল, ভূতেরা নিজেরা যে অন্য ভূতদের ভয় পায় না ; এ কথাটা ভানুপ্রতাপের আমাদের সম্বন্ধে ভাবা এবং জানা উচিত ছিল। সকলেই দৈত্য-জঙ্গলের কুসংস্কারাবদ্ধ মানুষ নয়। বিষেণদেওবাবুর কথা আলাদা। চিরদিনই এইরকম জায়গায় থেকেছেন, ধার্মিক, সরল প্রকৃতির লোক। ভূত-পেত্নীর ব্যাপারে ভয় পেয়ে বারবার নানারকম পুজো চড়াতেন উনি। নানা জায়গায়। এখানেও বনদেওতার আর বজরঙ্গবলীর মন্দিরে। তাতেও, তাঁর বোন-ভগ্নিপতীর আত্মা শান্ত হচ্ছে না দেখে

দুঃখী মনমরা হয়ে থাকতেন বেচারী সবসময়। এ কথাটাও সত্যি যে, বিষেণদেওবাবুর দাদা খুব অত্যাচারী, দুশ্চরিত্র লোক ছিলেন। সত্যি সত্যিই গয়ার এক বাঈজীকে তিনি ঐ নাচঘরে খুনও করেছিলেন। একথা আমি ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট সোর্স থেকে ভেরিফাই করে নিয়েছিলাম। বিষেণদেও সেকথা জানতেন বলেই ভাবতেন, সেই বাঈজী হয়ত সত্যিই পেত্নী হয়ে এসেছে, আর অপঘাতে মারা যাওয়ায় সুরিন্দারও ভূত হয়ে গেছে। বিষেণদেওবাবু হলেন এরকম চরিত্রের লোক। আর তায় ভাগ্নে পেল তার দাদুর চরিত্র। একেবারে নর্থ পোল্ সাউথ পোল্-এর ব্যাপার। সুরিন্দারও ফার্স্ট-রেট্ জেন্টেলম্যান্ ছিল। বুঝলি না, একেই বলে জিন্। কার মধ্যে যে পূর্বপুরুষদের কার জিন্ প্রভাব ফেলে, এবং কেন ফেলে, এই রহস্যের সমাধান করতে এখনও বিজ্ঞানীরা হিমশিম্ খাচ্ছেন।

আমি বললাম, আচ্ছা ঋজুদা, বাঘের খাবার কাছে যে জুতোর দাগ দেখেছিলে—সেই ডাক্‌ব্যাক কোম্পানীর জুতো ? সেটা কার ?

শুনলি না ? বিষেণদেওবাবু বললেন, ওঁদের দুজনের জুতোর মাপই এক। যেদিন আমি চটি নেওয়ার অছিলাতে বিষেণদেওবাবুর ঘরে যাই, সেদিন ঐ জুতোজোড়াকে বিষেণদেওবাবুর ঘরে দেখে আমি অবাক হই। কিন্তু জুতোর তলায় যে বালি লেগেছিলো তা চেঁচে নিয়ে আমি কাগজে মুড়ে নিই—পরে মেলাবো বলে। নদীর বালির সঙ্গে তা মেলে। জুতোটা কিন্তু গাম্-বুট নয়—অন্যরকম জুতো—একমাত্র ডাক্‌ব্যাক্‌ই বানায় তা। ভানুপ্রতাপ এমনই ধূর্ত যে, পরতো মামারই জুতো, বাঘের পায়ের-ছাপ নদীর বালিতে লাগাবার সময়—কিন্তু জুতো-জোড়া খুলে রেখে আসত আবার মামারই ঘরে। আমরা থাকতে থাকতে এবং ঐ দাগ দেখার সময় বিষেণদেওবাবু বাড়ির বাইরেই যাননি এবং গেলেও গাড়িতেই গেছেন, সঙ্গে অন্যান্য পাঁচমিশেলী লোক নিয়ে। ঐদিকেও যাননি, তা আমি চেক্ করেছি। আই এ্যাম এ্যাব্‌সোলুট্‌লী শ্যুওর।

ঋজুদা বলল, সামনে আলো জ্বলছে, দ্যাখ ত', এককাপ চা পাওয়া যায় কি-না, কোথাও!

তাই-ই ত'। হাজারীবাগ শহরের বাজারের অনেক দোকানেই আলো জ্বলছে। ব্যাপারটা কি ? আমি বললাম।

ও হো! কাল ত' মুসলমানদের পরব আছে রে একটা। বাঃ আমাদের বরাতই ভাল। দাঁড়া দাঁড়া।

গরম রুটি আর চাঁব দিয়ে আমরা চা খেলাম। চায়ের লিকারটা বড্ড স্ট্রং আর বড় বেশী চিনি ; এই-ই যা। তাও পাওয়া যে গেল রাত তিনটেতে এই-ই ঢের!

হাজারীবাগ শহর ছাড়িয়ে আমরা বগোদরের রাস্তা ধরলাম।

আমি বললাম, আচ্ছা ঋজুদা, ব্রিজনন্দনকেও মারল কেন ভানুপ্রতাপ ?

আসলে, ব্রিজনন্দন লোকটাও খুব ধূর্ত এবং লোভী ছিল। তা না হলে বিষেণদেওবাবুর সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করত না। এবং ভানুপ্রতাপের সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডর সাক্ষীও ছিল ও প্রথম থেকেই। প্রত্যেক খুনের আগে ভানু ব্রিজনন্দনকে আনিয়ে নিত উজ্জ্বানগর থেকে। আনাবার আরও একটা কারণ ছিল। যদি সন্দেহ কারো হয়ই তা যেন ব্রিজনন্দনেরই উপর হয়। ভানুপ্রতাপ বুঝতে পেরেছিল, কোলকাতা থেকে তুই ফিরলেই কিছু একটা করব আমরা। খুনীরা খুব বুদ্ধিমান হয়। তাছাড়া ভানু ত' বিলেতে পড়াশুনা-করা বাপ-মায়ের সু-পুত্তুর!

ঋজুদা তারপর বলল, পিস্‌কি নদীর ওদিক থেকে আমরা গাড়ি নিয়ে ওস্তাদ-রাত্‌রা রোড হয়ে মালোয়াঁ-মহলকে বাইপাস্ না-করে গেলে, হয়ত ব্রিজনন্দন বেঁচে যেত। কারণ, আমাদের যাওয়ার পথেই ত' পড়ত। নিজে লুকিয়ে না-পড়লে আমরা ওকে তুলেও নিতাম হয়ত গাড়িতে, যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে। মৃত্যু ছিল ওর কপালে। কি আর কথা যাবে?

আমি বললাম, তাই-ই যদি হয়, তাহলে ঐ সাপ আর হায়নার জিম্মাদারা বেহেড়ীয়াদেরও ত' উনি মারতে চাইতেন।

বেহেড়ীয়াদের মেরে দেওয়া বা অনেক টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া ভানুর পক্ষে কঠিন ছিলো না কিন্তু ব্রিজনন্দন ছিল অসম্ভব লোভী। ওর চোখেই সেই লোভ চক্‌চক্ করত। ও হয়ত শেষে ভানুপ্রতাপকেই সরিয়ে দিতে চাইত কিংবা পঙ্গু করে দিয়ে সবকিছু নিজে দখল করে নিতো এমন একটা সন্দেহও ভানুর মনে হয়েছিলো। অথবা ওর কৃতকর্মের একজনও সাক্ষী ভানুপ্রতাপ রাখতে চায়নি হয়ত। প্রথম দিন সাপটা যখন আমাদের আক্রমণ করল নাচঘরের রাস্তায় এবং কামড়াতে না-পেরে ফিরে গেল, তখন থেকেই ভানুর মনে নানারকম ভয় দানা বাঁধতে শুরু করে। তাই ব্রিজনন্দনের সব কাজ শেষ হওয়াতে এবং আমরা আজ রাতেই একটা হেস্তনেস্ত করব তাও হয়ত বুঝতে পারাতে ও তাকেও সরিয়ে দিল পৃথিবী থেকে। আমরা যখন আজ রাতে নাচঘরে ঢুকলাম, তার একটু আগেই ব্রিজনন্দনকে কামড়ে আসার পর সাপটাকে খাঁচায় পুরে দিয়েছিল বেহেড়ীয়ারা।

অতগুলো সাপ দিয়ে ওরা কি করত ঋজুদা!

উল্টোদিক থেকে আসা একটা ট্রাককে পাস দিয়ে, আমি শুধোলাম।

বাঃ। ওফিয়াফাগাস্ সাপ ত' সাপ খেয়েই বাঁচে। ওর খাওয়ার কাজও হতো—আর বেহেড়ীয়াদের ট্রেনিং-এ ঐসব সাপের মধ্যে কিছু সাপ দিয়ে মৃত্যুদূতের কাজও হতো—যেমন শুভাবৌদিকে মারা; আমার ঘরে আমাকে মারতে পাঠানো।

আমি বললাম, আচ্ছা, বিষেণদেওবাবুর ঘর থেকে যে সুড়ঙ্গ চলে গেছে নাচঘরে তা তুমি জানতে পেলে কি করে?

ঋজুদা একটুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল দ্যাখ্, একেই বলে ভাগ্য। আর ভানুপ্রতাপের নিয়তি। এটা একটা কো-ইন্‌সিডেন্ট্। অনেকদিন আগের কথা, আমি যাচ্ছি কানাডাতে আর স্যান্ডি যাচ্ছে ইউরোপে। বোম্বেতে দুজনেই কাস্টমস্ ক্লীয়ার করে যার যার প্লেনের জন্যে ওয়েট্ করছি। ও যাবে লুফ্‌থহান্‌সাতে, আমি যাব এয়ার-ইন্ডিয়ায়। হঠাৎ দেখা হওয়াতে অনেক গল্প হল। স্কুলের বন্ধু। বৌ-ছেলেমেয়ের কথা উঠল। ও বলল, আমার আর শুভার একটিই মাত্র সন্তান—। বলতে পারিস্, প্রিন্স-অফ-ওয়েলস্। তবে, ব্যাটা যে কি হবে ভগবানই জানেন। থাকে ত' আমার শ্বশুর মশায়, মানে শুভার বাবার কাছে—আদর দিয়ে দিয়ে একেবারে মাথায় চড়াচ্ছেন। জানিসই ত,' আমাদের ফ্যামিলীতে আমিই একমাত্র ছেলে, কাজিন্ পর্যন্ত নেই কোনো। তাই আমার ছেলেই, আমাদের ফ্যামিলীর একমাত্র বংশধর। তার উপর আমার শ্বশুর মশায়ের ব্যাপারই আলাদা—বেডরুমের থেকে সুড়ঙ্গ চলে গেছে নাচঘরে—সেখানে নাচ-গান হয় রাতের বেলা, বুঝলি। বলেই, আমার দিকে চেয়ে দুষ্টুমীর হাসি হেসেছিল। তাই, এখানে এসে, ঘটনার পর ঘটনা ঘটতে থাকায় একদিন বিষেণদেওবাবুকে জিজ্ঞেসও করেছিলাম: "আপনার বাবা কোন্ ঘরে শুতেন"? উনিই বলেছিলেন যে, ওঁর বাবার

ঘরেই এখন উনি শোন।

আমি বললাম, আচ্ছা ঋজুদা, বিষেণদেওবাবুকেও ত' ভানুপ্রতাপ সাপ দিয়েই মারতে পারত।

তা পারত। কিন্তু ভানুপ্রতাপের সাপের খেলা পুরনো হয়ে যাওয়ায়, বিষেণদেওবাবুকে অন্য কায়দায় মারতে চেয়েছিল ও। এবং প্রায় সাকসেসফুল হয়েও ছিল।

আসলে, শুভা আর সুরিন্দার দুজনেরই এমন হঠাৎ মৃত্যুর কথা বিষেণদেওবাবুর কাছে শুনে আমার মনে কেমন একটা সন্দেহ হয়েছিল। সন্দেহটা অবশ্য হয়েছিল বিষেণদেওবাবুরই উপর। এখানে আসতে রাজী হওয়ার আসল কারণও ছিলো এটা।

ঋজুদা বলল, আমার মনটা খুউবই খারাপ লাগছে। শুভা আমার প্রিয় বান্ধবী ছিল। বড় ভালো মেয়ে আর স্যান্ডি ত' ছিল স্কুলেরই বন্ধু—ওর কথাই আলাদা। এমন ভদ্র, শিক্ষিত, মার্জিত মানুষ খুব কম হয়। তাদেরই একমাত্র ছেলেকে আমি......

তারপর বলল, অন্যদিক দিয়ে দেখতে গেলে বলতে হয়, আমার বড় প্রিয় কাছের লোকদের যে খুন করেছে, তাকে এক্সপোজ্ করে দিয়ে নিজের বিবেকের কাছে নিজেকে শুদ্ধ করলাম।

আমি বললাম, যাই-ই বলো, অ্যাল্‌বিনোটা সত্যি হলে, আমি কিন্তু খুবই খুশী হতাম। সব গেঁটে গেল!

ঋজুদা একটু চুপ করে থেকে গম্ভীর গলায় বলল, রুদ্র, শুধু বাঘই কি আল্‌বিনো হয়? আমরা? মানুষরা? এই ভানুপ্রতাপ? বা বিষেণদেওবাবু? বাইরের রঙ আমাদের যা, তাই-ই কি আমাদের আসল রঙ? মনে মনে আমরা অনেকেই অ্যাল্‌বিনো। হয়ত সকলেই। বাইরের চামড়ার পিগ্‌মেন্টেশানের ত্রুটিটাই আমাদের চোখে পড়ে; আর মনের আসল রঙ চিরদিন চামড়ার আড়ালেই থাকে।

ভোর হওয়ার আগে আগে, অন্ধকার বনে ভোরকে পথ-দেখিয়ে জঙ্গলের মধ্যে যে একটা হাওয়া চলে, জঙ্গলের হৃদ্‌জাই গন্ধ বয়ে নিয়ে, ভোরের পাখিদের ঘুম-ভাঙিয়ে; রাতের পাখিদের ঘুম-পাড়িয়ে সেই হাওয়াটা চলতে শুরু করেছে। বনে বনে মচ্‌মচানি, ঝরঝরানি আওয়াজ তুলে সে তার চলাচল জানান দিচ্ছে, যারা জানতে চায়, তাদের।

খোলা জানলা দিয়ে হু হু করে হাওয়া আসছে। দূরে টাটীঝরীয়ার ডাকবাংলোটার দেওয়াল দেখা যাচ্ছে,—গাড়িটা চলেছে।—টপ্ গীয়ার ফেলে জানলায় কনুই আর স্টীয়ারিং-এ হাত রেখে বসে আছি, চোখ, হেডলাইট-পড়া আঁকা-বাঁকা উঁচু-নীচু জঙ্গলের পথে।

ঋজুদা এখন একদম চুপ করে গেছে। পাইপের ধুঁয়োয় আর গন্ধে গাড়ি ভরে উঠেছে। মালোয়াঁ-মহলের দুঃস্বপ্ন আর অ্যাল্‌বিনোর স্বপ্ন পিছনের লুলিটাওয়া আর টীমারীয়ার মধ্যের জঙ্গলের গভীরে ফেলে রেখে দ্রুত দূরে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা।

এই মুহূর্তে পিস্‌কি নদীর সাদা বুকে অথবা তার দু'পাশের আলো-ছায়া-ভরা জঙ্গলের মধ্যে হাতে খোলা রিভলবার আর রাইফেল নিয়ে একটি অ্যাল্‌বিনো বাঘকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন পুলিশের লোকেরা।

যদি ভানুপ্রতাপ পুলিশদের বাঘের ডাক-শুনিয়ে ভয় পাওয়াবার জন্যে টেপ-রেকর্ডার বাজান, তবে সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়ে যাবেন পুলিশদের হাতে। কারণ, এ টেপ-রেকর্ডারে বাঘ আর কোনোদিনও ডাকবে না। চাবি টিপলেই; জঙ্গল সরগরম্ করে বাঘের ডাকের বদলে, মেয়েলী গলায় বেজে উঠবে: "সাধের লাউ। বানাইলা মোরে বৈরাগী।"

ঐ উত্তেজনা, ক্লান্তি, মন-খারাপের মধ্যেও আমার হাসি পেয়ে গেল সাধের লাউ-এর কথা ভেবে।

কি রে ? হাসছিস যে !

বললাম, না। এমনিই।

তুইও মারিহুয়ানা ফারিহুয়ানা খেতে শুরু করেছিস না কি ? ভানুপ্রতাপের সঙ্গে মিশে ? পাগলের মত এমনি এমনি হাসছিস !

আমার তখন উত্তর দেওয়ার ইচ্ছে ছিলো না। ভট্‌কাইকে ফিরে গিয়ে এমন দেব। ছারপোকা বিধ্বংসী পাঁচন ওকেই গেলাব এবার। বুঝবে ভট্‌কাই।